KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ আষাঢ়, ১৩৬৭ শ্রাবণ, ১৩৬৭ ভাদ্র, ১৩৬৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ
কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

বই-এর নাম	লেখক

১। রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

২। হাতের রেখায় জীবন রহস্য—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড

৩। Expression & Language of the Unconscious—Sri Sabyasac

৪। নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব—শ্রীসব্যসাচী

৫। নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬। জ্যোতিষী শিক্ষা—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০.০০

৭। Jyotish Sanchayan

৮। Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hint
Answer—Viswanath Deva Sarma

৯। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী

১০। Table of Ascendants & Ephemeris—By N. C. Lahiri

১১। লঘুজাতকম্—অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য

১২। বৃহৎজাতকম্—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

১৩। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
ঐ ৩য় খণ্ড

১৪। গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল—ডাঃ রণতোষ সাহা

১৫। ফলদীপিকা—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

১৬। ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়

১৭। জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ—শ্রীমলয় রায়

১৮। মিথ্যা নয়, সত্য—প্রীতি রায়

১৯। গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল—ডাঃ রণতোষ সাহা

ভি পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১০.০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অ

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টম বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৬৭

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

লক্ষ্মীর সংসার

জামশেদপুর ইস্পাত কারখানায় ১৯১২ সালে প্রথম ইস্পাত তৈরী শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই এক অল্পবয়সী আদিবাসী স্বামী-স্ত্রী এসে কাজে ঢুকেছিল। স্বামী সীতারাম হাঁসদা আজ জীবিত নেই। স্ত্রী লক্ষ্মী হাঁসদার বয়স এখন ৬১ বছর। কারখানার কাজ থেকে সে গত বছর অবসর নিয়েছে কিন্তু কারখানার সঙ্গে তার পারিবারিক সম্বন্ধ এখনো বজায় রয়েছে—তার তিন ছেলের মধ্যে দু'ছেলে এই ইস্পাত কারখানায় কাজ করছে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সেরাইকেলার এক ছোট পল্লী থেকে জামশেদপুরের যে এলাকায় লক্ষ্মী প্রথম এসে আস্তানা পাতে, আজও সেখানেই সে তার মস্ত সংসার—ছেলে, মেয়ে ও নাতি-নাতনী নিয়ে ঘরকন্না করছে। এককালের সেই নিঃশব্দ জনমানবহীন অঞ্চল এখন আদিবাসীদের কর্মতৎপরতায় মুখর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব কুঁড়ে ঘর, প্রশস্ত রাস্তা, জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে গড়ে উঠেছে এবং লক্ষ্মীর স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে জায়গাটির নাম রাখা হয়েছে সীতারামডেরা।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের মত আদিবাসীরাও জামশেদপুরে ঘর বেঁধে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে, কেননা শিল্প সেখানে শুধু জীবিকার্জনের উপায় নয়, জীবন যাপনেরই একটি অঙ্গ।

জামশেদপুর

ইস্পাতপুরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 4085

৮ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

সমকালীন

বৈশাখ ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা। অমিয়নাথ সান্যাল ১

সাহিত্য পাঠনা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরচনা। রথীন্দ্রনাথ রায় ১৭

ছিন্নপত্র। সোমেন বসু ৩৭

কৌতুক-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ। অজিতকৃষ্ণ বসু ৪৩

সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৪৯

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ ও রাগিণীর বিচার। নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৫৪

রবীন্দ্ররচনা-সূচী। পুলিনবিহারী সেন, পার্থ বসু ৬১

জাতীয় উৎসব। রাখাল ভট্টাচার্য ৬৭

সমালোচনা। মঞ্জুলা বসু ৬৫

প্রচ্ছদপট। সত্যজিৎ রায়

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা

অমিয়নাথ সান্যাল

সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'নাটাশাস্তম্' নামে গ্রন্থ ভারতীয় অভিনয় কলা ও গীত-বাদ্য-নৃত্ত-নৃত্য কলা ও আনুষাঙ্গিক শিল্পবিদ্যা বিষয়ে প্রাচীনতম ও বৃহত্তম আধার শাস্ত্র। শিল্পবিজ্ঞান শ্রেণীতে এই গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলনকারী শাস্ত্রকারগণ আবহমান কাল থেকে এই গ্রন্থের সাদর উল্লেখ করেছেন। কবি ও সাহিত্যসেবী প্রাচীন বিবুধগণ যাকে "অলঙ্কারশাস্ত্র" নামে অভিহিত করেন, এই 'নাটাশাস্তম্' সেই অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল উৎস। বিষয়-নির্বাচন,রচনা-পদ্ধতি, বস্তু বিচার পূর্বক আদর্শ স্থাপনা এবং সম্যক প্রয়োগ-বিধান সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম ওসমূহ দৃষ্টি এবং সমৃদ্ধ পরিকল্পনা ভারতীয় অপর কোন গ্রন্থে লক্ষ্য হয় না। এই গ্রন্থকে জ্যেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মনে করে বলা যায় পণ্ডিতবর শ্রীশার্ঙ্গদেব প্রণীত "সঙ্গীতরত্নাকর" নামে অন্য সমজাতীয় গ্রন্থ শ্রীমান অনুজ তুল্য। মহামুনি ভরত নামে বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের মূল উপদেষ্টা রূপে স্বীকৃত হয়েছেন বলেই গ্রন্থের নাম "ভরতনাট্যশাস্ত্র" বা "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র" নামেও উল্লেখ করা হয়। ঐ একই কারণে নাটাশাস্ত্রের বহু ও বিভিন্নকালীন ব্যাখ্যাকারগণ "ভারতীয় ব্যাখ্যাকার" নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই অপূর্ব গ্রন্থ ও ভরতমুনি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে চিরস্মরণীয়।

প্রসঙ্গত, "নাটাশাস্তম্" এবং আধুনিক কালে উদ্ভূত "ভরত-নাটাম্" নামে নৃত্য-নাট্য সম্প্রদায় , —উভয়ের মধ্যে নামসাদৃশ্য থাকলেও বস্তুত 'নাটাশাস্তম্' নামে গ্রন্থ ও "ভরত-নাটাম্" নামে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও রকম অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। নামসাদৃশ্যের কারণে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গ বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

"নাটাশাস্তম্" নামে গ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। মাত্র দু'খানি নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে মুদ্রিত সংস্করণ হয়েছে। ভারত বর্ষে প্রকাশিত সংস্করণ যথা "কাশী চৌখাম্বা" সংস্করণ ও "বোম্বাই কাব্যমালা" সংস্করণ*।

পাণ্ডুলিপিগুলি আবিষ্কার ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা কৃতূহলী গবেষক তাঁরা 'কাব্যমালা' সংস্করণের ভূমিকা অংশ এবং অন্য দু'খানি সংস্করণের* উপক্রমণিকা অংশ পাঠ করে পরিতোষ লাভ করবেন আশা করা যায়।

নাট্যশাস্ত্রের অনুবাদ গ্রন্থের নিজস্ব বিশিষ্ট মূল্য আছে। অনুবাদ ছাড়া সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করা ও অনুশীলন করার যোগ্যতা সুবিরল। পাদটীকায় উল্লিখিত দু'খানি অনুবাদগ্রন্থ যে পাঠকের সহায়তা করবে একথা বলাই বাহুল্য। আমি অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য যে, মাত্র সঙ্গীত বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ইং ১৯৩৭ সালে যখন চৌখাম্বা সংস্করণের পাঠ আরম্ভ করেছিলাম, তখন শ্রীসুবোধচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ রচনা আমার মানসিক প্রস্তুতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল; যদিও এই গ্রন্থে নাট্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিষয় অনধিকৃত। প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুবর শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব এই গ্রন্থখানি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন যে 'অংশত সাহায্য পাবেন'। যাই হ'ক, গ্রন্থের উপক্রমণিকা পাঠ করে এবং তার মধ্যে নাট্যশাস্ত্রের বহু বিচিত্র পাণ্ডুলিপির প্রাসঙ্গিক বর্ণনা লক্ষ্য করে মনে হয়েছিল, নাট্যশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপির অনুশীলন করতে হ'লে ভারতবর্ষ ছেড়ে সমুদ্র পার হ'য়ে ইউরোপীয় দেশে গিয়ে কিছুকাল বাস করাই উচিত। শ্রীহারীতকৃষ্ণকে ঐকথা বলতেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন লবণসমুদ্র পার না হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপনীত হওয়া বা ক্ষীরমন্থন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কথাটা স্পষ্ট, তবে একটা ব্যঙ্গও আছে। শাস্ত্রীয় সংস্কৃত ভাষার কষায়লাবণিকতা অনুশীলক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করেন।

কষায়-লাবণিকতা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। তাহ'লেও, একাধিক পাণ্ডুলিপির তুলনামূলক গবেষণার অভাবে, উপস্থিত লভ্য মুদ্রিত একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ অনুশীলন করলে ক্ষীর-মন্থন সম্ভব হবে না, এমন কথা মনে করিনি। কারণ কলিকাতায় ইং ১৯৩৮ সাল থেকে পূজ্যপাদ শ্রীকেদারনাথ সাঙ্খ্যতীর্থ মহোদয় আমাকে "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থ পড়িয়ে ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করেছিলেন। অবসরসঙ্গতি ক্রমে, কিভাবে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ, বিশেষ করে নাট্যশাস্ত্রের মতো দুরূহ গ্রন্থের মধ্যে এবং সূত্র-রচনার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে হয়, তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই অভূতপূর্ব অপরিসীম কৃপা-অনুগ্রহের বলেই নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করতে সাহসী হয়েছিলাম। নচেৎ নাট্যশাস্ত্রকে নমস্কার করে আলমারিতে সাজিয়ে রাখাই সার হ'ত। পরে, কৃষ্ণনগরে, সংস্কৃত অধ্যাপক মাননীয় শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক মাননীয় শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় যত্ন ও আগ্রহ সহকারে আমার বহু জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করে-ছিলেন, অনেক তর্ক-সংশয়ের সুমীমাংসা করে দিয়েছিলেন। এঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ আছি। ঐ সময়ে নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গীত ঘটিত অংশের ইংরাজিতে অনুবাদও করে রেখেছিলাম। যাই হক, সম্প্রতি অর্থাৎ ইং ১৯৫৬ সালে বিচক্ষণ সংস্কৃত সেবী মাননীয় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় আমাকে কাব্যমালা সংস্করণ একখানি গ্রন্থ উপহার করেছিলেন এবং নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা সমেত

---

*কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ ইং ১৯২৯ সালে কাশী "বিদ্যাবিলাস" মুদ্রণযন্ত্রের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত। সম্পাদক কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ শর্মা এম· এ·, সাহিত্যোপাধ্যায় এবং শ্রীবলদেব উপাধ্যায় এম. এ., সাহিত্যশাস্ত্রী। **বোম্বাই কাব্যমালা সংস্করণ** (২য় সংস্করণ) ইং ১৯৪৩ সালে বোম্বাই "নির্ণয়সাগর" মুদ্রণযন্ত্র কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত। সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ সাহিত্যভূষণ।

* *The Natyasastra of Bharata; Chapter Six Rasadhyaya* on the sentiments; with Abhinavabharati, a commentary by Abhinavagupta; edited with an English Translation of Rasadhyaya, by Subhodhchandra Mukherji Sastri, 1926.

The Natyasastra, ascribed to Bharata-Muni; translated into English by Monomohan Ghosh, M.A., Ph.D., Calcutta Royal Asiatic Society of Bengal, 1951.

গান্ধর্বাংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনা করতে উপদেশ পরামর্শ দিয়েছিলেন। বস্তুত, এই উপদেশ পরামর্শ ও উৎসাহ্য বাক্য সম্বল করেই ভূমিকা রচনার কাজে হাত দিয়েছিলাম।

নানা রকমের পাঠক ও অনুশীলক ব্যক্তি আছেন। কেউ হয়ত' পাঠ করে চিত্তবিনোদন মাত্র কাম্য মনে করেন। কেউ বা মাত্র ঐতিহাসিকতথ্য সংগ্রহের জন্যই আগ্রহ ও পরিশ্রম করেন। আবার, কেউ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন করে যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তু লাভ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন না।

লেখকের পক্ষে কথা এই যে মূল নাট্যশাস্ত্র থেকে উক্ত তিন রকমের কাম্য ফল আদায় করা যায়। অন্য কথা এই যে, সাম্প্রতিক প্রচেষ্টায় ভ্রম-প্রমাদের আশঙ্কা আছে এ বিষয়ে লেখক অবহিত। যাই হ'ক, ঐ ভয় পরিহারের উদ্দেশ্যে আমি একটি শ্লোক স্মরণ করি। যথা

দোষভীতেরনারম্ভা স্তৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
কৈরজীর্ণভয়াদ্ ভ্রাতঃ ভোজনং পরিহীয়তে।

অর্থাৎ আহারার্থে উপবেশন করে' কে'ই বা অজীর্ণভয়ে ভীত হয়ে ভোজনে নিরস্ত হয়? কেহই ত' নহে! যথার্থত অজীর্ণের আশঙ্কা থাকলে ভোজনের নিমিত্ত আসন গ্রহণ করাই উচিত নহে। সুতরাং দোষভয়ে কর্মত্যাগ করাও বুদ্ধিমানের পক্ষে উচিত নহে। আরভ্য কর্ম ত্যাগ করলে একমাত্র নিষ্কর্মতাই ত্যাগকারীর প্রাপ্ত হয়। কোন কর্মই বা আছে, যার মধ্যে দোষের সম্ভাবনা একেবারেই নেই!

প্রথমে চৌখাম্বা সংস্করণ অনুশীলন করেছিলাম। অনেক পরে কাব্যমালা সংস্করণের তুলনামূলক পাঠ করার সুযোগ ঘটেছে। তবে, পূর্বকৃত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা ত্যাগ করার বিশেষ কারণ পাইনি।

সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে চৌখাম্বা সংস্করণকে 'চৌ-সং' নামে, এবং কাব্যমালা সংস্করণকে "কা-সং" নামে উল্লেখ করেছি। সংস্করণ নামের অনুল্লেখ স্থলে পাঠক বুঝে নেবেন"চৌ-সং" ই ইঙ্গিত হয়েছে।

সাধারণ পরিচয়

সমগ্রত' নাট্যশাস্ত্র ৩৬শ অধ্যায় (কা-সং ৩৭ অধ্যায়) দিয়ে বিরচিত। সামান্য দৃষ্টিতে উভয় সংস্করণে পরিকল্পনা অভিন্ন। চৌ-সংস্করণে সর্বশুদ্ধ ৫৫৫৬ শ্লোক এবং কা-সংস্করণে ৫৩৬৯ শ্লোক গ্রথিত দেখা যায়। প্রত্যেক সংস্করণে যৎসামান্য গদ্য পাঠও আছে। প্রসঙ্গত অভিনয় কলা ও গীত বাদ্য নৃত্য কলা বিষয়ে অপর একমাত্র বৃহদাকার গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকর [১] আদ্যো-পান্ত ৪৭৩১ শ্লোকে গ্রথিত। এই গ্রন্থে গদ্যাংশ যোজিত হয়নি।

প্রত্যেক অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকের অব্যবহিত পরে অধ্যায়গত বিষয়ের সাধারণ নাম ও ক্রমিক অধ্যায়-সংখ্যা গদ্যে পঠিত। অধ্যায় বিভাগগুলি স্পষ্ট।

কিন্তু অন্য এক প্রকার আন্তরিক বিভাগও আছে। কতকগুলি পরস্পর আশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সমষ্টি দিয়ে এই বিভাগগুলি গঠিত। অনুশীলনের পক্ষে এই বিভাগগুলির একান্ত ও মৌলিক প্রয়োজন আছে।

---

১. শ্রীনিঃশঙ্কশার্ঙ্গদেব প্রণীতঃ সঙ্গীত রত্নাকরঃ। সম্পাদক শ্রীহরিনারায়ণ আপতে। পুণা 'আনন্দাশ্রম' মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ইং ১৮৯৭ সাল।]

নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান ভাবে দু'রকমের কথা ও দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গি আছে। প্রথম ও প্রধান হ'ল বিজ্ঞান বা প্রয়োগ-বিজ্ঞানের কথা; যাকে কাজের কথা বলতে পারি। দ্বিতীয় হ'ল ইতিহাস--গল্পের কথা অর্থাৎ কথার কথা।

এই দু'রকমের কথা ও দৃষ্টিভঙ্গির গূঢ় পরিচয় রয়েছে আন্তরিক বিভাগের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের মধ্যে। এদের প্রকাশভঙ্গি গড়ে উঠেছে, উত্তম-পুরুষ ঘটিত আরম্ভ-বাক্য দিয়ে এবং প্রথম পুরুষ (বা নাম-পুরুষ) ঘটিত বিবৃতির ধারায়।

কথা-প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের অন্য একরকম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ যোগ্য। কাজের কথা ও কথার কথার অতিরিক্ত তৃতীয় একরকমের কথা,—যথা দার্শনিক তত্ত্ব-কথা (ইংরাজিতে যাকে অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট ফিলসফি বলতে পারি) নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য যাবতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীতগ্রন্থে বিকীর্ণ দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক বা কাজের কথাই হ'ল উৎকৃষ্ট কারণ এ রকম কথা দিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা ও কর্মারম্ভ সম্ভব। কথার কথাকে মধ্যম গণ্য করি, কারণ এর মধ্যে কর্মপ্রেরণা না থাকলেও কিছু গল্পের স্বকীয় চমৎকারিত্ব থাকে, কর্মের পরিকল্পনা না থাকলেও সাংস্কৃতিক মান-অভিমানের সরস ও সুদূরপ্রসারিত ছায়া থাকে। আর তৃতীয় অর্থাৎ তত্ত্বকথার অবতারণাকে সঙ্গীত-বিজ্ঞান ও অভিনয়বিদ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট মনে করেছি। কারণ তত্ত্বকথায় কাজ মাটি; যার ফলে অন্য সমস্ত কথাও ধূলা-বালির মতো উপেক্ষণীয় হয়ে পড়ে।

নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে একটিও তত্ত্ব কথা নেই। অবাস্তবতা বা অনির্বাচ্যতা নাট্যশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক দিগন্তকে কুয়াসার মতো অস্পষ্ট করেনি।

নাট্যশাস্ত্রে কিছু নীতি কথা আছে। কিন্তু যা আছে সেটা বাস্তব আদর্শ ও লোকায়ত বুদ্ধির (ইংরাজিতে যাকে "অব্জেক্টিভ আইডিয়ালিজিম্" এবং "প্রাগমাটিজম" বলতে পারি, তারই) অনুগত হয়ে আছে। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়; যেমন, ২৪শ অধ্যায়ে ২৮৫ শ্লোক থেকে ২৮৯ শ্লোক পর্যন্ত "সামান্য অভিনয়" প্রসঙ্গে বর্জনীয় ব্যাপার ঃ

ন কার্যং শয়নং রঙ্গে নাট্যধর্মং বিজানতা।
কেনচিদ্ বচনার্থেন অঙ্কচ্ছেদো বিধীয়তে ॥ ২৮৫ ॥

এর অব্যবহিত পূর্ব প্রসঙ্গে শৃঙ্গার-রস প্রযুক্ত অন্তঃপুর সম্বন্ধীয় অভিনেয় ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে। অন্তঃপুর কর্মের মধ্যে শয়ন বা শয্যাগ্রহণ অভিনেয় কর্ম হ'তে পারে; অবশ্য সঙ্গতি সাপেক্ষ রূপে। কিন্তু, এই রকম অঙ্কে শৃঙ্গার রসের সূচনা থাকলে রঙ্গমঞ্চে শয়ন কার্য অভিনয় বর্জন করতে হবে। কেমন করে? কোন ও কিছু বাচনিক ইঙ্গিতে বা অর্থের বশে অঙ্কচ্ছেদ করে দেওয়াই কর্তব্য। কিহেতু? অর্থাৎ মাত্র বাস্তবতার খাতিরে শয্যা গ্রহণ দৃশ্য উপস্থিত করলে দোষ কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে "নাট্যধর্মং বিজানতা" অর্থাৎ—নাট্যধর্মের যথার্থ আদর্শ জ্ঞানের বশেই এস্থলে শয়নাভিনয় নিষিদ্ধ কার্য।

নাট্যধর্ম কা'কে বলে? নাট্যকর্মের বাস্তব আদর্শের দু'টি ধারক বস্তু আছে; নাট্যধর্ম এবং লোকধর্ম। যেমন, রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ, পরস্পর তরবারির আঘাত, একজনের পতন এবং মৃত্যুও হয়ত' অভিনেয়। কিন্তু—সেই মৃত্যু বাস্তব লৌকিক মৃত্যু নয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় মৃত্যুই হ'ল নাট্যধর্মানুযায়ী মৃত্যু। এক্ষেত্রে বাস্তব মৃত্যু ঘটলে প্রেক্ষাগৃহ শোকার্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠবে; পুলিশ আসবে। অতএব, অবিমিশ্র অপ্রয়োজনীয় বাস্তবতা কখনই অভিনেয় হ'তে পারেনা। এই হ'ল নাট্যধর্মের একটি মূল নীতি। এই নীতি অনুসারেই রঙ্গমঞ্চের "মাতাল" কখনই বমন বা অন্য গর্হিত আচরণ করেন না যদিও তাঁকে ভূমিকার বশে কোন না কোন 'রকমের পানোন্মত্ত ব্যক্তির অনুকরণ করতেই হবে।

অন্তঃপুর দৃশ্যে শৃঙ্গারসুলভ ব্যাপারের পক্ষে শয়ন নিষেধ করার পক্ষে অন্য হেতুও আছে। নাট্যশাস্ত্রের স্বকীয় দৃষ্টিতে শৃঙ্গারোচিত সমগ্র পরিবেশের অভিনয় পক্ষে মূল ও প্রধান কথা হল উজ্জ্বল বেশাত্মকতা শুচিতা মেধ্যতা ও দর্শনীয়তা। ৬ষ্ঠাধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকের পর গদ্যাংশ যথা—"তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভাব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ। যথা যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যং দর্শনীয়ং বা তৎ শৃঙ্গারেণানুমীয়তে। যস্তাবদুজ্জ্বলবষঃ স শৃঙ্গারবানিত্যুচ্যতে।" সরল অর্থ হ'ল—"শৃঙ্গার নামে রস রতিনামক স্থায়িভাব থেকে উদ্ভূত; এই শৃঙ্গার উজ্জ্বল-বেশাত্মক। যেমন, লোকব্যবহারে যা কিছু **শুচি পবিত্র** বা **দর্শনীয়** প্রত্যক্ষ সে সমস্ত থেকে শৃঙ্গারের অনুমান হয়। চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট বেশধারী ব্যক্তিকে শৃঙ্গারবান বলা হয়।" এই অর্থ গ্রহণ করে বুঝতে পারি শৃঙ্গারের মধ্যে দীপ্তিমানতা আছে, নির্মলতা আছে, পবিত্রতা আছে, সৌম্য ভাবও আছে। প্রসঙ্গত, অমরকোষে শৃঙ্গারের প্রতিশব্দ পক্ষে বলা হয়েছে "শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ।" নাট্যশাস্ত্রের শৃঙ্গার-রস বা অভিনয়ের মধ্যে যা নেই, এবং যা থাকলে দুধের মধ্যে অম্ল রস যোগের মতো শৃঙ্গার রস ও অভিনয় বিপর্যস্ত হয়, সেটা হল কামুকতা বা রিরংসার ভাব অথবা ইঙ্গিত। নাট্যশাস্ত্রের 'শৃঙ্গার' কামগন্ধহীন।

প্রসঙ্গত, ৭ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের পরেই গদ্য বাক্যে "রতি" নামক স্থায়িভাব প্রসঙ্গে পরিস্কার বলা হয়েছে,— "তত্র রতির্নাম আমোদাত্মকো ভাবঃ"। আমোদ অর্থে সর্বজন প্রীতিকর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-আহ্লাদ। একে কাম-কামনার উল্লাস বা তর্পণ মনে করার কিছু মাত্র হেতু নেই। কারণ পূর্বে শৃঙ্গারের রস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ঋতুমাল্যানুলেপনাভরণপ্রিয়জনপরভবনানুভবনাপ্রাতিকূল্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েৎ- স্মিতবচনমধুরবচনভ্রূক্ষেপকটাক্ষাদিভিরনুভাবৈঃ।" শৃঙ্গারের উদ্যোতক বা উদ্দীপক বিভাবে নামে পদার্থ হল ঋতু (যথা বসন্ত), মাল্যানুলেপন, আভরণ ধারণ, প্রিয়জনসমাগম, বর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) ভবন ও অনুভবন এই কয়েকটির সম্বন্ধে অপ্রাতিকুলতা অর্থাৎ সহযোগিতা। এই ব্যাপারগুলি বিশিষ্ট কয়েকটি অনুভাব দিয়ে অভিনেয়, যথা,—স্মিতবচন, মধুর বচন, ভ্রূক্ষেপ কটাক্ষ প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" এস্থলে স্মরণের যোগ্য। মহাপ্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্গার বা "রতি" শব্দটি ব্যবহার করেন নি। ভালই করেছেন। তিনি জানতেন বাংলা ভাষায় **"রতি"** শব্দটি কোন দিকে ঝুকে পড়েছে। 'রম' ধাতু থেকে **'রমণ', 'রমণী' "রমণীয়" ও 'রতি'** শব্দগুলি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। রম-ধাতুর অর্থে, অথবা ঐ শব্দগুলির মুখ্যার্থে মাত্র যৌনসম্ভোগ-মিলন গ্রহণ করা নিতান্ত অসঙ্গত। দুঃখের বিষয়, নাট্যশাস্ত্রের কতিপয় টীকা-ব্যাখ্যাকার ও আধুনিক অনুবাদকবর্গ ঐ এক-চক্ষু অর্থ করে নাট্যোপদেশের স্রোতকে পঙ্কিল ও আবিল করেছেন। স্বয়ং অভিনব গুপ্তই যখন 'শৃঙ্গার'কে কাম অর্থে গ্রহণ করে লিখেছেন—"**তত্র কামস্য** সকলজাতিসুলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতিহত্যেতি **পূর্বং শৃঙ্গারঃ** তদনুগামী হাস্যঃ" ইত্যাদি, তখন অন্যকে দোষ দিয়ে আর লাভ কি! অভিনব গুপ্ত বলেছেন যে যদি প্রশ্ন হয় শৃঙ্গারকে রসের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হ'ল কেন, তার মীমাংসাকল্পে বুঝতে হবে যে **সর্বপ্রাণীজাতির পক্ষে কাম (অর্থাৎ যৌন-অভিসন্ধানই) হ'ল সুলভ এবং অতিপরিচিত ব্যবহার**; সুতরাং এই কাম, অর্থাৎ (নাট্যশাস্ত্রের) পূর্বোক্ত শৃঙ্গার অন্য সকল রসকে প্রতিহত করে' (ধাক্কা দিয়ে) নিজে অগ্রণী হয়; এর পরে 'হাস্য' রস হ'ল শৃঙ্গারের অনুগামী"! আমার ধারণা, শ্রীমদভিনব গুপ্ত শৃঙ্গার-কাম অভিসন্ধানী ব্যাখ্যাকারদের অন্যতম অগ্রগামী ছিলেন। তিনি যথার্থত নাট্যশাস্ত্রীয় শৃঙ্গার-রসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলে নিজস্ব মত, অর্থাৎ "শৃঙ্গার-কাম" মত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে। কারণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনুবাদকের দল তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন; যা অতীব

স্পষ্ট এবং আপত্তিকর।

নাট্যশাস্ত্রের 'শৃঙ্গার' ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করে শয়ন-নিষেধ উপদেশটি গ্রাহ্য। যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক দৃশ্যমান রঙ্গমঞ্চে অন্তঃপুর পরিবেশের মধ্যে উত্তম অলঙ্কার মাল্যাদি ধারণ করে বিশুদ্ধ আমোদে এইমাত্র উল্লসিত হ'ল, সেই পুরুষ বা স্ত্রী যদি সেই অঙ্কেই শয্যায় শয়ন করে, তাহলে তাকে উন্মত্ত বা হঠাৎ পীড়াগ্রস্তই মনে করতে হয়। লোকে সহজ বুদ্ধিতে মাল্যভরণ খুলে ফেলে চাকচিক্যযুক্ত বেশ পরিবর্তন করে' পরে শয়ন করে। বেশ পরিবর্তনের ব্যাপার প্রকাশ্যে ঘটে না। এই সমস্ত যুক্তির সম্ভব-অসম্ভব বিচার করে দেখলে উল্লিখিত উপদেশের তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। পরবর্তী শ্লোকগুলিও উদ্ধার করা যায়, যথাঃ

যদা স্বপেদর্থবশাদেকাকী সহিতোঽপিবা।
চুম্বনালিঙ্গনং চৈব তথা গুহ্যং চ যদ্ ভবেৎ।।২৮৬।।
দন্তং নখক্ষতং ছেদ্যং নীবীসংস্রনমেবচ।
স্তনাধরবিমর্দং চ রঙ্গমধ্যে ন কারয়েৎ।।২৮৭।।
ভোজনং সলীলক্রীড়াং তথা লজ্জাকরং তু যৎ।
এববিধং ভবেদ্ যদ্‌যত্ তত্তদ্রঙ্গে ন কারয়েৎ ।।২৮৮।।
পিতাপুত্রস্নুষাশ্বশ্রুদৃশ্যং যস্মাত্তু নাটকম্।
তস্মাদেতানি সর্বাণি বর্জনিয়ানি যত্নতঃ ।।২৮৯।।

শ্লোকগুলির অর্থ স্পষ্ট বোধে অনুবাদ করলাম না। তবে সামান্য টীকার প্রয়োজন আছে। 'যদা স্বপেদ্ অর্থবশাদ' অর্থাৎ অন্য কোন কারণে বিশেষ উদ্দেশ্যের বশে। পিতাপুত্রাদি থেকে "যত্নতঃ" পর্যন্ত বাক্যের তাৎপর্য এই যে—লোকসমাজে যতকাল পিতাপুত্র প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধ থাকবে, ততকাল পর্যন্ত লোকধর্ম ও নাট্যধর্মের কল্যাণজনকতার প্রত্যাশা করে' এই নীতি আচরণীয় হ'ক। যেকালে পারিবারিক সমাজপ্রতিষ্ঠা থাকবে না, সেকালে এই উপদেশ নিরর্থক হবে, এমন কথা বলাই বাহুল্য।

নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে যুক্তিসাপেক্ষ ভাবে এ-রকম অন্য অনেক নীতিবাক্য আছে। এ-সকল বাক্য কোনও শাব্দ বা আর্ষপ্রমাণের অপেক্ষা করে না। কি হেতু এবং কি রকম উপায় অবলম্বন করে লোক ব্যবহারের নির্জলা ও নিদারুণ বাস্তবতাকে নাট্যের কল্যাণকর উদ্দেশে লোকোত্তর সৃষ্টিতে পরিণত করা যায়, সেই হেতু ও উপায়ই হল নাট্যশাস্ত্রীয় নীতি ও বিধান-বিষয়ক উপদেশের লক্ষ্য।

নাট্যশাস্ত্রীয় বিধি-বিধানগুলির মধ্যে, বিশেষ করে বিজ্ঞান-অংশে অসংখ্য প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দ অজস্র ধারায় প্রবাহিত দেখা যায়। এ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করি নি। আমার ধারণা এগুলি একত্রিত করে ভারতীয়-কোষ বা অন্য নামে একখানি নিঘণ্টু বা পরিভাষাগত অভিধান রচনা করা যায়। যাই হ'ক, অর্থ উদ্ধার করা যায় না এমন অনেক পারিভাষিক শব্দও আছে। যেকালে ভরত-প্রবর্তিত নাট্য-সম্প্রদায় গম্যমান ছিল এবং শাস্ত্রের প্রাথমিক সম্পাদনা ঘটেছিল, সেকালে, এমন কি তারও পূর্বে কোন 'নিঘণ্টু'ও ছিল। ৬ অধ্যায়ে ১২ ও ১৩ শ্লোকে 'নিঘণ্টু' ও 'নিরুক্ত' শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগই এপক্ষে অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। অনুমান হয়, 'কোষ' ও 'অভিধান' শব্দ দু'টি পরবর্তীকালে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, নাট্যশাস্ত্রের প্রাথমিক সম্পাদনার কালে ঐ দু'টি শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহৃত ছিল না।

সুপ্রচলিত "সঙ্গীত" শব্দটি নাট্যশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে ব্যবহৃত হয় নি।

মাত্র দুই স্থানে (এবং মাত্র চৌ-সংস্করণের) "সঙ্গীত" শব্দটির প্রয়োগ আছে। কিন্তু, অন্য অর্থ সূচিত হয়েছে। যথা—

সঙ্গীতকর্মপরিক্লেশো নিত্যং প্রমদাজনস্য গুণ এব।
মধুরকর্কশত্বং ভবতি নাট্যপ্রয়োগেন ॥ ২৭ ॥

অব্যবহিত পূর্ব শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকের সঙ্গতি গ্রাহ্য। পূর্ব শ্লোকে স্ত্রী-ভূমিকায় স্ত্রীলোকদের কর্মনির্দেশের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পুরুষসমাশ্রয় প্রয়োগই কাম্য; যতখানি সম্ভব। এ বিষয়ে **প্রাথমিক যুক্তি যোজনা করে** ২৭ শ্লোকের উপদেশ করা হ'ল। এর অর্থ যথা—সঙ্গীত (অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিতভাবে) কর্মে শ্রমক্ষমতা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্য গুণ (সমাজ-পরিবার মধ্যে আবাল্য জীবনযাত্রা হেতু)। নাট্যে প্রয়োগের জন্য এই নিত্য গুণের মধুর-কর্কশ (মিশ্রত্ব) হ'তে বাধ্য। অর্থাৎ এই মধুর কর্কশত্ব সর্বথা পরিহার করা নাট্যপ্রয়োগে অসম্ভব, কারণ, নাট্যাতিরিক্ত সমাজ-জীবনে এই মিশ্রত্ব অনিবার্য ও অপরিহার্য।

তর্কস্থলে যদি 'সঙ্গীত কর্ম' অর্থে গীত-বাদ্য-নৃত্ত-নৃত্যকর্ম ধার্য করা হয়, তাহ'লে এই **"বহুকর্মক্ষমতা" প্রত্যেক স্ত্রীলোকের** নিত্য গুণ, এমন সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, ৩২শ অধ্যায়ে যোগ্য গায়ক-বাদকদের নাট্যপ্রয়োগে নির্বাচনযোগ্যতা প্রসঙ্গে ৪৬৫ শ্লোকে (কা-সং **৩৩শ** অধ্যায় ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) বলা হয়েছে,

প্রায়েণ তু স্বভাবাৎ **স্ত্রীণাং গানং নৃণাং চ বাদ্যবিধিঃ।**
স্ত্রীণাং স্বভাবমধুরঃ কন্ঠো নৃণাং বলত্বঞ্চ ॥ ৪৬৫ ॥

অর্থ স্পষ্ট। স্ত্রীলোকদের কণ্ঠ স্বভাবেই মধুর, সুতরাং গানের পক্ষে, বিশেষ করে ধ্রুবা গানের পক্ষে স্ত্রীগায়িকাই নির্বাচনীয়। পুরুষগণ স্বভাবেই অধিকতর বলী। সুতরাং, বাদক পক্ষে পুরুষেরাই নির্বাচনীয়। এ-রকম পূর্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে তর্কপক্ষীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গতি হয় না।

বস্তুত, গীত-বাদ্য-নৃত্ত-নৃত্য অর্থে বা গীত-বাদ্য-নৃত্য অর্থে **'সঙ্গীত' 'তৌর্যত্রিক'** শব্দ **দু'টি নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় গৃহীত হয়নি।** এদুটি শব্দের আবির্ভাবের পূর্বে নাট্যশাস্ত্র সম্পাদিত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'সঙ্গীত' শব্দের অর্থান্তরে মাত্র 'গীত' বা 'সম্যক গীত' এস্থলে উদ্ধরণীয় এ-রকম আপত্তিও হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে, নাট্যপ্রযুক্ত গীত বা সম্যক গীত মধুর ও কর্কশ হতে পারে এমন অর্থ বা অভিপ্রায়ও স্বীকার করতে হয়। আপত্তির নিরসনকল্পে বলা যায় যে, **৩২শ** অধ্যায়ে গায়ক-গায়িকা নির্বাচন সম্বন্ধে (৪৫৯-৪৬১ শ্লোক; কা-সং ৩৩শ অধ্যায় ২—৪ শ্লোক) গুণবিচার প্রসঙ্গে কন্ঠের পেশলতা (স্বরোচ্চারণের বল, দৃঢ়তা) মধুরতা ও স্নিগ্ধতা নামে গুণাবলীর পরীক্ষার উপদেশ আছে। সঙ্গীত অর্থাৎ গীত ব্যাপারে কর্কশতা আদৌ পরিহার্য। অতএব, ঐ আপত্তি নিরর্থক।

নাট্যশাস্ত্র পরিভাষা-বহুল শিল্প-বিজ্ঞান শ্রেণীর রচনা। এ-রকম রচনার মধ্যে কাব্যস্ফূর্তির আশা করা যায় না। তা হ'লেও, নাট্য ও গান্ধর্ব ব্যাপারের অঙ্গীভূত রূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ যথাযোগ্য স্থানে প্রকরণীভূত হয়েছে। অভিনয় কর্মের পাঠ্যাংশে নানা প্রকার ভূমিকার মধ্যে সংস্কৃত বাক্য, স্তোত্র বা ছন্দোবদ্ধ কবিতার যেমন প্রয়োজন আছে, সে রকম প্রাকৃত শৈলীর বাক্য ও লোকগীতিরও প্রয়োজন আছে। ছন্দোবিচিতি নামে

১৬শ অধ্যায়ে সুললিত ও বিচিত্র ছন্দোবন্ধ রচনার সম্বন্ধে নিয়ম ও উত্তমোত্তম দৃষ্টান্ত করা হয়েছে। এই খণ্ডে দেখা যায় যে এতাবৎ কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ছন্দোবিশারদ পন্ডিতবর্গ ও কাব্যমোদী পাঠকবর্গ যাকে "মন্দাক্রান্তা" নামে অনুশীলন করে এসেছেন, সে একই ছন্দ "শ্রীধরা" নামে উদাহৃত হয়েছে। কবিতাটি উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

স্নানৈশ্চূর্ণৈঃ সুখসুরভিভি র্গন্ডলেপৈঃ সুধূপৈঃ
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ শিরসিরচিতৈ র্বস্ত্রযোগৈশ্চ তৈস্তৈ।
নানারত্নৈঃ কনকরচিতৈরঙ্গসম্ভোগসংস্থৈ
র্ব্যক্তং কান্তে কমলনিলয়া শ্রীধরা ত্বং বিভাসি ।।৮১।।

কা-সংস্করণে "গন্ডলেপৈঃ" স্থলে "গন্ধসারৈঃ", "পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ" স্থলে "পুষ্পৈর্মাল্যৈঃ" "কনকরচিতৈঃ" স্থলে "কনকখচিতৈঃ" এবং "কমলনিলয়া" স্থলে "কমলনিলয়ে" পাঠ আছে। এগুলির তুলনা করে মনে হয়েছে "গন্ডলেপৈঃ", "পুষ্পৈর্মাল্যৈঃ" ও "কনকখচিতৈঃ" পাঠগুলি সঙ্গতি ও সুশ্রবত্ব গুণে যোগ্যতর। অন্য একরকম কারণে "কমলনিলয়া" শ্রেয়তর মনে হয়েছে। কাব্যের প্রাণবস্তু বলতে কীই বা জানি, কতটুকুই বা বুঝি। অল্প জ্ঞান-বোধের ভিত্তিতেই মনে হয়েছে, এই কবিতার প্রাণবস্তু অতি অল্প; প্রজাপতির প্রাণবস্তুর মতো। কিন্তু, কবিতার দেহ, ছন্দ ও অঙ্গসৌষ্ঠব পরীক্ষা করে অবয়বের সৌন্দর্য বুঝতে পারা যায়। এই কবিতাটি বারবার পড়ে মনে হয়েছে এর মধ্যে প্রসাদ আছে ; অধিকন্তু, ললিত বিচিত্র শব্দসন্দোহের মধ্যে "ঐঃ" কারের মুহুর্মুহু উচ্চারণগুলি যেন শ্রীধরা লক্ষ্মীর আসন-পদ্মে অভিনিবিষ্ট চিত্রচ্ছদ প্রজাপতি-দের ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত পক্ষস্পন্দন। মাত্র অনুপ্রাস নাম দিয়ে ঐগুলির অমর্যাদা করব' না। রচনার শব্দ-বিভ্রম আছে, তার সৌন্দর্যও প্রত্যক্ষ করা যায় যদি ভাল করে পাঠ-আবৃত্তি করা হয়। এই সৌন্দর্যকে নগণ্য মনে করিনি। আমার শ্রবণ-মননে 'শ্রীধরা' ছন্দোনামটি 'মন্দাক্রান্তা' নাম থেকে সার্থকতর প্রতিভাত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রের প্রধান বা বৈজ্ঞানিক অংশে, অর্থাৎ ৬ষ্ঠ থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত অংশে (কা-সং ৬ষ্ঠ—৩৬শ অধ্যায়) অধ্যায়ের পর অধ্যায় অবিরল ধারায় করণ উপকরণের বাহনে অসংখ্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রয়োগ বিধান পরিবেশিত হয়েছে। তবুও, বাহন ও বিষয়গুলি অভিনিবিষ্ট পাঠকের চিত্তে বৈচিত্র্য হীন বা ক্লান্তিকর বোধ হয় না। এর কারণ হ'ল এই যে বহু ও বিচিত্র সমবৃত্ত ও অসমবৃত্ত ছন্দ দিয়ে বাহনের সজ্জা-বন্ধন ঘটেছে; অসংখ্য অজ্ঞাতপূর্ব বিষয় বিজ্ঞানা-কারিত হয়ে পদে পদে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। স্থানে স্থানে গদ্য বাক্যে ভাবার্থ বা তাৎপর্য স্পষ্ট করা হয়েছে। কদাচিৎ অপ্রত্যাশিত স্থানে উপমা-মধুর বাক্যে প্রয়োগঘটিত বিধি বিধানকে উজ্জ্বলতর রূপ দান করা হয়েছে। শিল্প-বিজ্ঞান শাস্ত্রে এরকম বাচনপদ্ধতির ব্যবহার বিরল হওয়াই সাধারণ। বিরল অথচ মধুর বলেই এরকম দু'একটি উপদেশ উদ্ধৃত করছি।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়ে ২০ শ্লোক থেকে ৪৪শ শ্লোক পর্যন্ত স্থানে স্বরগত (ষড়জাদি স্বর সংশ্লিষ্ট) বর্ণ ও অলঙ্কার পৃথক ভাবে উপদিষ্ট হয়েছে (কা-সং ২৯শ অধ্যায় ১৭ থেকে ৪৬ শ্লোক পর্যন্ত)। এর মধ্যে ৪টি স্বরগত বর্ণের নাম ও কর্মলক্ষণ, এবং ৩১টি অলঙ্কারের নাম ও কর্মলক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। এর পরে ৪৫ শ্লোক থেকে ৭৩ শ্লোক পর্যন্ত স্থানে বিশেষ পরস্পরাশ্রিত বর্ণালঙ্কার উপদিষ্ট হয়েছে। সমাহার যথা

গীতালঙ্কারাণাং করণবিধিরিয়ং যথাবদুপদিষ্টঃ।
এভিরলংকর্তব্যা গীতিবর্ণাবিরোধেন ॥ ৭৩ ॥

অর্থস্পষ্ট। কিন্তু, **গীত ও গীতি এক বস্তু নয়; এদুটি** সজাতীয় ভেদাভিন্ন পদার্থ; গীত হ'ল সাধারণ যে কোনও নাট্যগীত বা গান। গীতি হ'ল নাট্যের পঞ্চসন্ধি স্থানে শৃঙ্গারাদি রস-ভাবাশ্রয়, ও বিশেষ ভাবে প্রস্তুত ধ্রুবাগীতি (৩২শ অধ্যায়; বিশেষ ৪৫২-৪৫৪ শ্লোক)। তাৎপর্য এই যে, গীত-গানের পক্ষে করণ-বিধি ঘটিত সাধারণ নিয়মের অল্প-স্বল্প ব্যতিক্রম হয় হ'ক; কিন্তু ধ্রুবা-গীতির পক্ষে গীতির বর্ণের (উদাত্ত-অনুদাত্ত প্রভৃতি চারবর্ণ; ১৯শ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকের পর থেকে ৪৩ শ্লোক পর্যন্ত) অবিরোধেই সর্বথা বর্ণালঙ্কার প্রয়োগ করতে হবে।

এর পরেই শ্লোক যথা

স্থানে চালঙ্কারং কুর্যান্নহ্যুরসি কাঞ্চিকাং বধ্নেৎ।
অতিবহবোহলঙ্কারা বর্ণবিহীনাস্তু যোক্তব্যাঃ ॥ ৭৪ ॥
শশিনা রহিতেব নিশা বিজলেবনদী লতা বিপুষ্পেব।
অবিভূষিতেব চ স্ত্রী গীতালঙ্কারহীনা স্যাৎ ।।৮৫।।

এর পরে, গীতি-লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রকরণের মধ্যে বাস্তব উপদেশাবলী বয়ে চলেছে ১৪৯ শ্লোকে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত। যাই হ'ক 'অলঙ্কার' সমন্ধে উপদেশ-বস্তুগুলির মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের স্বরূপলক্ষণ ও কর্ম-লক্ষণগুলি পরীক্ষা করে এবং নাট্যশাস্ত্রীয় রাগ-বিন্যাসের (সর্বশুদ্ধ ৩৭৩, কিছু কম বেশী) দু-চারটির সঙ্গে কন্ঠস্বরচেষ্টায় যোজনা করে বুঝলাম 'অলঙ্কার' বিষয় করণ-প্রকরণগুলি সার্থক ও অব্যর্থ। মনে হ'ল যেন প্রসিদ্ধ স্বর্ণকার-জহুরীর সমৃদ্ধ বিপণীর মধ্যে এসে পড়েছি। ভাবলাম, নাট্যশাস্ত্রীয় গীতি-রাগবিন্যাসের সমস্তগুলিই বর্ণালঙ্কার বিভূষিত করাই উপদেষ্টার অভিপ্রায়। কিন্তু, এই ৭৪ ও ৭৫ শ্লোকের বিশিষ্ট অভিসন্ধি বুঝে ঐ সাধারণ অভিপ্রায়কে সঙ্কুচিত করতে **হল। স্থানভেদে** ভূষণ-যোজনা করতে হয়, **কাঞ্চিকা** (অর্থাৎ ক্ষুদ্র মেখলা বা চন্দ্রহার) কখনও বক্ষ-প্রলম্বমান করতে নেই, একথা এমন কিই বা অজ্ঞাত রহস্যের জ্ঞাপক হ'ল যে কবিতা-প্রয়োগ না করলে পাঠক বুঝতে পারবেন না!! এবং রজনী চন্দ্রমাহীন হ'লে, নদী জলহীন হ'লে, লতা পুষ্পহীন হ'লে তথা প্রমদাজন নিরাভরণ হ'লে যেমন দর্শকের কিছু আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যায়, সে রকম **গীতি** অলঙ্কারহীন হ'লে নাট্য প্রেক্ষকেরও মন ভরেনা। উপমাগুলি তাহলে মাত্র পাঠকের চিত্ত-চমৎকারির জন্য!

বস্তুত, তা নয়। এই দু'টি শ্লোক ও উপমার সাহায্যে পূর্বোপদিষ্ট সাধারণ অভিপ্রায়ের বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সংকোচ সাধন করা হয়েছে। এই নূতন অভিসন্ধিই অনুশীলকের পক্ষে আহরণীয় চিত্ত-চমৎকারিটা হল উপরি পাওনা। অভিসন্ধি যথা :

'স্থানে' (সাধারণ অর্থ যথা যোগ্য স্থানে) অলঙ্কার প্রয়োগ হবে; অযোগ্য স্থানে, যেমন মেখলা নামে নিতম্বভূষণকে বক্ষোদেশে যোজনা করে, অলঙ্কার প্রয়োগ করবে না। বিশেষ অভিসন্ধি হল (১) রাগ-বিন্যাসের **মন্দ্র-মধ্য-তার স্থান** (চলতিকথা উদারা-মুদারা তারা স্থান) ভেদে যোগ্য স্থানে অলঙ্কার করতে হবে; এবং (২) ধ্রুবাগীতির প্রসঙ্গে **"স্থানাপ্রয়োপেত"** পঞ্চবিধ ধ্রুবাগীতির ভেদ উদ্দিষ্ট হয়েছে (৩২শ অধ্যায় ৩৩৩ শ্লোক থেকে ৩৬৯ শ্লোক পর্যন্ত)। ১৯শ ও ৩২শ অধ্যায়ে মন্দ্র-মধ্যাদি স্থান প্রসঙ্গীভূত হয়েছে। অতএব স্থানভেদে বিভিন্ন বর্ণালঙ্কারের যোগ্য প্রয়োগ বিধেয়।

"অতিবহবোহলঙ্কারা বর্ণবিহীনাস্তু যোক্তব্যাঃ বাক্যের অভিসন্ধি এই যে—অলঙ্কারের অতিপ্রয়োগেরও প্রয়োজন ঘটে। অঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে এমনও গীত-বাদ্য নির্দিষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে চার বর্ণের (পাঠ্যপক্ষে উদাত্ত-অনুদাত্ত প্রভৃতি, এবং স্বরপক্ষে স্থায়ি-আরোহী প্রভৃতি) মধ্যে **যে-কোনও দু'টি বর্ণের অভাব কাম্য।** এই বিশেষ প্রকার গীতিবাদ্য যোগের মধ্যে অতি-

বহু অলঙ্কার (অর্থাৎ ত্রয়স্ত্রিংশৎ অলঙ্কারের মধ্যে কমপক্ষে চারিটি ও বেশীপক্ষে সমগ্র তেত্রিশটি অলঙ্কার) প্রয়োগ করা বিধেয়।

যথাযোগ্য এবং অতিবহু অলঙ্কার প্রয়োগের পরেই স্বাভাবিক প্রশ্ন হয়,—অলঙ্কারহীন গীতিও কি প্রযোজ্য হতে পারে? সাধারণ উত্তর এই যে, গীত বা গীতি বা গান, যাই হ'ক, অলঙ্কারহীন হলে ভাল লাগে না; সুতরাং নিরলঙ্কার গান পরিহার্য। একথা এমন কিছু অজ্ঞাত-জ্ঞাপক নয়। জানতা বা অজানতা গায়কেরা অলঙ্কার প্রয়োগ করেন।

'শশিনা রহিতেব নিশা' ইত্যাদির (উদ্ধৃত ৭৫ শ্লোক) মধ্যে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক, যোগ্য ও চরম উত্তর নিহিত রয়েছে। শ্লোকের শেষে 'স্যাৎ' শব্দটি বিশিষ্ট অভিসন্ধির সূচক। দৃশ্যত, এই শ্লোক বিধিবাক্য; নিষেধ বাক্য নয়। এর বিশদ অর্থ, যথাঃ

সাধারণত, যেমন চন্দ্রমারহিত রজনী, জলহীন নদী, পুষ্পহীন লতা এবং নিরাভরণা স্ত্রী চিত্তকে কৃতার্থ করে না, সে রকম অলঙ্কারহীন গীতিও চিত্তকে কৃতার্থ করে না। কিন্তু, নাট্য ব্যাপারে এমনও প্রস্থানভেদ আছে, যেস্থলে অভীপ্সিত ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত অলঙ্কারহীন (কিন্তু বর্ণহীন নয়) গীতির প্রয়োগই বিধেয়। যথা—বিপ্রলম্ভ করুণ ও বীভৎস ও ভয়ানক রসের উদ্যোতক বিভাব-অনুভাব প্রকৃতির কোনও কোনটি নাট্যের ইতিবৃত্তানুগত অঙ্ক বা দৃশ্যের লক্ষ্য হ'তে পারে। সেরূপ স্থলে, যেমন চন্দ্রমারহিত রজনী, বা জলহীন নদী, বা পুষ্পহীন লতা অথবা আভরণবর্জিত স্ত্রীলোকের অভিনয়াদি স্ব স্ব মাহাত্ম্যে সার্থক হয়, সেরকম সেই সেই অকণিষ্ঠ গীতি অলঙ্কারবর্জিত ও মাত্র বর্ণযুক্ত হয়ে সেই সেই অভিনয়াদি সার্থক করে। নাট্যগত অভিনয় (আঙ্গিক বাচিক আহার্য ও সাত্ত্বিক ভেদে চার রকম) এবং গান্ধর্বানুগত স্বরসম্বন্ধীয় চারিটি বর্ণ পরস্পরে ও যথাবিহিত রূপে মিলিত হয়ে যথাভিলষিত স্থায়ী ভাবকে পরিস্ফুট করুক এবং তন্নিষ্ঠ রসকে স্বাদনযোগ্য করুক, এই হ'ল এই শ্লোকের নিগূঢ় অভিসন্ধি।

প্রসঙ্গত এই শ্লোক দুটি এবং অন্যান্য প্রচুর শ্লোক আভাসে সরল অথচ, অর্থসম্পদে কূট সূত্র বা ভাষ্যের রূপ ধারণ করেছে। একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে মন্তব্যটি পরিষ্কার করা উচিত মনে করি।

নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায় থেকে 'গান্ধর্ব-সংগ্রহ' নামে অনাত্ম অংশের আরম্ভ, যথা, —১৮ শ্লোকের শেষার্দ্ধেঃ

গান্ধর্বসংগ্রহো হ্যেষ বিস্তরাৎ চ নিবোধত ॥ ১৮ ॥

এর পূর্বে ৮ শ্লোক থেকে ১৭ শ্লোক পর্যন্ত যথাক্রমে উপক্রম করে, নাট্যোপযোগী গান্ধর্বের অধিকার, গান্ধর্ব শব্দের ঐতিহ্যগত ব্যুৎপত্তি, করণ বিধির সাধারণ দিঙ্‌নির্ণয়, পারিভাষিক প্রকরণ উপদিষ্ট হয়েছে। উদ্ধৃত বাক্যের তাৎপর্য এই যে—নাট্যোপযোগ চিন্তা করে পূর্বতন "নারদীয় গান্ধর্ব" সূত্র-ভাষ্য থেকে * ভরত মুনি গান্ধর্ব-সংগ্রহ উদ্ধার করে উত্তমপুরুষ ঘটিত বাক্যে উপদেশ আরম্ভ করলেন। উপদেশগুলি বিস্তারিত; সংক্ষিপ্ত নহে।

সর্বপ্রথম বৃত্তি, যথা ঃ "তত্র স্বরাঃ"

ষড়জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত চ স্বরাঃ ।।"

* ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১-১৪ শ্লোকে সংগ্রহে সংজ্ঞা প্রভৃতি উপদিষ্ট হয়েছে। ৩২শ অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকে গান্ধর্ব-সংগ্রহের (গান্ধর্ববের নয়) সমাপ্তিসূচক বাক্যও দ্রষ্টব্য।

এর অর্থ স্পষ্ট ও সরল। কিন্তু ঐ রকম অর্থ থেকে বস্তুগত তাৎপর্য উদ্ধার ত' হয়ই না। অধিকন্তু, ২১ শ্লোকের পরে, গদ্যাংশের মধ্যে "বিবাদিনস্তু যেষাং **বিংশতিস্বরমন্তরম্**" বাক্যের স্পষ্ট ও সরল অর্থের সঙ্গে বিরোধও স্পষ্ট দেখা যায়। প্রথমেই সন্দেহ হয় এই বাক্যটি হয় ত' প্রক্ষিপ্ত। পরে সন্দেহ হয়, ঐ প্রক্ষিপ্ত বাক্যও ভ্রমপূর্ণ; শ্রুতিযোগ দিয়েই যখন 'বাদী-সম্বাদী' অভিসজ্ঞিত হল (২০ শ্লোক এবং পরবর্তী গদ্যাংশে) তখন, এই বাক্যটি "বিংশতি-শ্রুত্যন্তরম্" হওয়াই উচিত, নচেৎ ক্রম-পদ্ধতি বিনষ্ট হয়।

যথার্থ তাৎপর্য অনুসরণ করলে "সপ্তচস্বরা ঃ" এবং "বিংশতি স্বরমন্তরম্" বিরোধদুষ্ট নয়; এবং ক্রমপদ্ধতিও নষ্ট হয় নি।

গান্ধর্বের সর্বপ্রথম প্রকরণ 'স্বরবিধান'। ২১ শ্লোকের পর গদ্যাংশে বলা হয়েছে "ইত্যেতৎ-স্বরবিধানচতুর্বিধম্" অর্থাৎ "তত্র স্বরাঃ" থেকে আরম্ভ করে এই নিবৃত্তিসূচক বাক্যের অব্যবহিত পূর্ববাক্য পর্যন্ত অংশই 'স্বরবিধান' এবং স্বরবিধান করণের মধ্যে চার রকমের ভেদ উপদিষ্ট হয়েছে।

এই স্বরবিধান ধীরভাবে অনুধাবন করলে বুঝতে পারি (ক) নাট্যশাস্ত্র মতে ষড়জাদি সাতটি স্বর পরম্পরাপেক্ষক; (খ) বাইশটি শ্রুতির মধ্যে **ঊর্ধ্বপক্ষে কুড়িটি স্বরস্থাপনা সম্ভব** এগুলি স্বর-ব্যক্তির অবস্থান-ভেদ; (গ) সেই কুড়িটি স্বর মূলে সাতটি স্বরজাতিতে গণ্য, এবং **ষড়জঋষভাদির নামগুলি জাতিবাচক ব্যক্তিবাচক নয়।** সুতরাং, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তভেদ ঘটে নি। জাতিবাচক নাম যথা ষড়জ; ব্যক্তিবাচক নাম যথা দ্বিশ্রুতিক ষড়জ, ত্রিশ্রুতিক ষড়জ, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ঋষভ নামে জাতির আশ্রিত বিভিন্ন ঋষভ, এবং গান্ধার প্রভৃতি অন্যান্য স্বর বিষয়ে জাতি ও ব্যক্তিভেদ গ্রাহ্য। স্বরের জাতি-ব্যক্তি ভেদ এতই প্রয়োজনীয় জ্ঞান যে এর অভাবে (ক) বাদী প্রভৃতি স্বর স্থাপনা অসম্ভব (খ) ষড়জ-মধ্যম দুই গ্রাম ও গ্রামরাগ মূর্চ্ছনার বাস্তব অনুশীলন অসম্ভব (গ) চৌরাশি মূর্চ্ছনার বস্তু-পরিচয় অসম্ভব এবং (ঘ) নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ জাতির সন্ধান একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

অতঃপর ক্রমভঙ্গ দোষের প্রসঙ্গ। উপদেষ্টা "বিবাদিনস্তু " ইত্যাদি বাক্যে 'তু' শব্দ দ্বারা স্বয়ং ক্রমভঙ্গ সূচিত করেছেন এখন প্রশ্ন হয়—ক্রমভঙ্গের হেতু কি?

স্বরবিধানের স্বর-শ্রুতি সম্বন্ধ অনুশীলন করার সময়ে অনিবার্যরূপে তর্ক হয়, যথা স্বর ও শ্রুতি কি একই পদার্থ, না কি ভিন্ন পদার্থ? এর মীমাংসা না হলে বাদী প্রভৃতির স্থাপনা চিরকাল সন্দিগ্ধ থেকে যায়। এই প্রশ্নও সন্দেহের নিরসনকল্পেই উপদেষ্টা "বিংশতিস্বরমন্তরম্" বাক্যে স্বর ও শ্রুতির অভিন্নত্ব ইঙ্গিত করলেন। তিনি যদি বলতেন "বিবাদিনশ্চ যেষাং বিংশতিশ্রুত্যন্তরম্ তাহ'লেও প্রশ্ন ও সন্দেহ নিরস্ত হয় না। অতএব, নির্গলিত সার হ'ল,—স্বর ও শ্রুতি স্বরূপে এক ও অভিন্ন বস্তু; শ্রুতিগুলির যোগ বা অনবচ্ছিন্ন বিন্যাস দ্বারা স্বরগুলির পরস্পর সম্বন্ধ সাধিত হয় বলেই, শ্রুতি ন্যূনতম পরিমাপক বস্তুরূপে গ্রাহ্য। এই স্বর-শ্রুতির একত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশেই বলা হয়েছে "বিবাদিনস্তু যেষাং" ইত্যাদি।

কার্যত, উল্লিখিত "তত্র স্বরাঃ" ও ১১শ শ্লোকটি স্বয়ং একটি সূত্র; অনুরূপভাবে, ২০শ শ্লোকও একটি সূত্র। এবং পরবর্তী গদ্যাংশ, ১৯ ও ২০ শ্লোকের সংগ্রহাকারিত ভাষ্য।

নাট্যশাস্ত্রে সূত্র ও ভাষ্যের সংজ্ঞা বা লক্ষণ উপদিষ্ট হয় নি। এ রকম অনুশ্লেখ থেকে মনে করতে হবে যে নাট্যোপদেষ্টা সূত্র-ভাষ্য বিষয়ে সংজ্ঞা-লক্ষণ পূর্বাসিদ্ধ ঐতিহ্যরূপেই গ্রাহ্য মনে করেছিলেন। অর্থাৎ, উপদেষ্টার আবির্ভাবকালে সূত্র-ভাষ্য পণ্ডিতজন ও বিদ্বানবাক্তির অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রীয় প্রধান অংশ দুটি হ'ল 'নাট্যসংগ্রহ' ও "গান্ধর্ব-সংগ্রহ"।

এই সংগ্রহ রচনার পদ্ধতি অভিনব গণ্য হয়েছিল বলেই, উপদেষ্টা সংগ্রহের সংজ্ঞালক্ষণ* বিশেষ-ভাবে উপদেশ করেছেন। পুনশ্চ, তিনি 'কারিকা', 'নিঘণ্টু' ও "নিরুক্ত" পক্ষে সংজ্ঞা-লক্ষণ উপদেশ করেছেন। এর এক মাত্র হেতু এই যে, তখন পর্যন্ত কালের বিদ্বান সমাজে কারিকা' 'নিঘণ্টু' ও 'নিরুক্ত' বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ভেদজ্ঞান ছিল না।

প্রসঙ্গত, পরবর্তী সংগীতশাস্ত্রকারেরা যাকে 'প্রকরণ' নামে অভিহিত করেছেন, নাট্য-শাস্ত্রের 'কারিকা' ও এই 'প্রকরণ' একই পদার্থ। যথা—নাট্যশাস্ত্রের দৃষ্টিতে, প্রসঙ্গাভূত "তত্র স্বরাঃ" থেকে "ইত্যেতৎস্বরবিধানচতুর্বিধম্" হ'ল "স্বরবিধান-কারিকা"। অনুশীলনের সুবিধার জন্য আমরা একে 'স্বরবিধান-প্রকরণ' মনে করতে পারি।

[* ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯ শ্লোক সংগ্রহের সংজ্ঞা; ১০শ শ্লোকে নাট্যসংগ্রহের এগারটি করণ-পদার্থ বর্ণিত হয়েছে।]

সাহিত্য পাঠনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল বই ও পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিন্তু তার ফলে সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কথা বলা যায় না। বিদ্যালয়ে সাহিত্যের স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রই অন্য বিষয়ের পাঠ নিতে উৎসুক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয় পড়বার জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এখন বিশেষজ্ঞের যুগ; সুতরাং বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য এই আগ্রহ স্বাভাবিক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সমাজবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সাহিত্য সকলের জন্য। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্যচর্চা নিবদ্ধ নয়। তাই সাহিত্যের শেষ পাঠ গ্রহণ করেও বিশেষজ্ঞের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করা যায় না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান এই অবজ্ঞার ফলে সমাজে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার সমীক্ষা আবশ্যক। সমাজের সকল স্তরে চরিত্রের যে শিথিলতা দেখা দিয়েছে তার জন্য সাহিত্য-বিমুখতা হয়ত অনেকটা দায়ী। বিশেষ করে ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যত অভিযোগ সাহিত্য-পাঠের উপর জোর দিলে তা কিছু হ্রাস পেত বলে মনে হয়। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমের এমন সুনির্দিষ্ট বিষয়-বিভাগ ছিল না। বিজ্ঞানের ছাত্রও সাহিত্য পড়ত। চিত্তবৃত্তির সামগ্রিক বিকাশের জন্য এই মিশ্র পাঠক্রম বিশেষ উপযোগী। শুধু দেশের সমাজের মধ্যেই সাহিত্য-পাঠের উপকারিতা নিবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাহিত্যের সহায়তা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের বৈঠক যতই হোক না কেন তাতে জাতির সঙ্গে জাতির অন্তরের মিল হয় না। সেই মিলনের জন্য সাহিত্যের সেতু চাই। জাতির চিন্তা-ভাবনা ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মহৎ সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত থাকে। কোনো দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে অধিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়। অপরিচয় সন্দেহ ও সংঘাতের মূল কারণ। এই অপরিচয় দূর করে সাহিত্য আন্তর্জাতিক মিলনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। ইউনেস্কো এই সত্য উপ-লব্ধি করে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য অনুবাদের উপর জোর দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ঠিক এই কারণেই য়ুরোপ আমেরিকায় বিশ্ব-সাহিত্য পঠন-পাঠনের প্রসার ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে দেশের গণ্ডিতে ফিরে আসা যাক। জন মর্লি বলেছেন : "Literature is one of the instruments, and one of the most powerful instruments, for forming character, for giving us men and women armed with reason, braced by knowledge, clothed with steadfastness and courage, and inspired by that public spirit and public virtue of which it has been well said that they are the brightest ornaments of the mind of man". তিনি আরও বলেছেন; Poets, dramatists, humorists, satirists, masters of fiction....teach us to know man and to know human nature. This is what makes literature....a proper instrument for a systematic training of the imagination and sympathies, and a genial and varied moral sensibility".

মহৎ সাহিত্যের মধ্যে জীবনের রূপ যেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও শিক্ষা যেরূপ গভীরতা লাভ করে, প্রত্যক্ষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার যথেষ্ট আভাস

পাওয়া যায় না। কারণ, আমাদের যে জীবন নানা তুচ্ছতা ও অপ্রয়োজনীয়তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে যায়, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, শক্তিশালী লেখক তাঁর কলা-কৌশলের দ্বারা তারই উপর আলোকপাত করেন। যা আগে দেখিনি তা চোখে পড়ে। নানা ভাবনায় বিক্ষিপ্ত মন বইয়ের মধ্যে সংহত হয়; সুতরাং জীবনানুভূতি গভীর হতে পারে।

মহৎ সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব। জীবন সম্বন্ধে বহু মানুষের বহু যুগের অভিজ্ঞতা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। এই শিল্পমণ্ডিত অভিজ্ঞতা পথ নির্বাচন করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে। ব্যক্তি তার অসম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার গণ্ডি অতিক্রম করে সাহিত্যে জীবন-সমুদ্রের স্বাদ পায়। ভবিষ্যতের অপরিচিত পথে চলবার ইঙ্গিতও সংগ্রহ করা যেতে পারে সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে। জীবনের পথে যারা নতুন যাত্রা শুরু করেছে সেই তরুণ-তরুণীদের পথ-চলার সমস্যা শুষ্ক উপদেশ দিয়ে যতটা সমাধান করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী পারা যায় সাহিত্যে বিধৃত যুগযুগান্তের শিল্পমণ্ডিত অভিজ্ঞতা থেকে। আর সবচেয়ে বড় লাভ হল, সাহিত্য পড়ে তারা নিজেরাই নিজেদের পথ নির্বাচন করে নেয়, হৃদয়ানুভূতির গতি নিয়ন্ত্রণ করে, উপদেশের মতো উপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় না। এই জন্যই চরিত্রগঠনের একটি প্রধান উপায় সাহিত্যপাঠ। সাহিত্যের পঠন-পাঠন উপেক্ষা করবার অর্থ শুধু আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া নয়; মানবজাতির চিরাগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ সুযোগ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করা।

আধুনিক সভ্য সমাজে অনেক কামনা-বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। কয়েক শতাব্দী পূর্বের সমাজেও যা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল এখন তা পরিতৃপ্ত করবার উপায় নেই। এই অবদমিত কামনার তাড়নায় ব্যক্তির জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় কিংবা তার মানসিকতা খর্ব হয়। ফ্রয়েড বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে বিকল্প পরিতৃপ্তির উপায় সাহিত্য পাঠ। বিশেষ করে উপন্যাসের মধ্যে পাঠক তার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পাত্র-পাত্রীদের জীবনে পূর্ণ হয়েছে দেখতে পায়। অথবা, নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কাহিনীর মধ্যে দেখতে পেয়ে উপলব্ধি করে জীবন শুধু তাকেই বঞ্চনা করেনি। এমন বঞ্চনা সংসারের সর্বত্রই আছে। সুতরাং অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বিক্ষোভ উপন্যাস পাঠ করে খানিকটা শান্ত হয়। এই বিক্ষোভ শান্ত হবার পথ না থাকলে জীবন উচ্ছৃঙ্খল হবার আশঙ্কা থাকে। উপন্যাসের প্রাচুর্য একালের কৃত্রিম জীবনের অভিশাপ কিছু পরিমাণে লঘু করতে পেরেছে। উপন্যাসের জগতে আমাদের কামনা-বাসনাকে প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়ে আমরা খানিকটা স্বস্তির লাভ করি।

তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত নাগরিকের চরিত্রগঠন ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাহিত্যপাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে সাহিত্য পাঠনার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে বই পড়ার সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের প্রতি ছেলেবেলায় আকৃষ্ট না হলে পরবর্তী জীবনে বই পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে উপযুক্ত বই ও উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন।

বেশী দরকারী উপযুক্ত বই। বই ভালো না হলে যোগ্য শিক্ষকও কিছু করতে পারেন না। আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের কোনো নির্দিষ্ট মান নেই। ক্লাশ প্লি-র বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হবে সে সম্বন্ধে কোনো পন্থতি স্থির হয়নি। তাই একই শ্রেণীর জন্য লিখিত বইয়ের মান বিভিন্ন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে সমীক্ষা করে দেখা হয় কোন বয়সের ছেলেমেয়ে কোন কোন শব্দ সর্বদা কথাবার্তায় ব্যবহার করে। সেই শব্দের তালিকা সামনে রেখে সে সব দেশের লেখকরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। আমাদের দেশে তেমন সমীক্ষা

হয় না; লেখকরা নিজেদের খুশিমতো শব্দ ও উপমা ব্যবহার করেন। এসব বই সাধারণতঃ যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের বোধশক্তির তুলনায় উচ্চমানের হয়। তাই সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে বিরূপতার সৃষ্টি হয়। শুধু পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেই এ কথা সত্য নয়; ছেলেদের জন্য লেখা অধিকাংশ গল্পের বইয়েও পাঠকের বয়স ও শক্তি অনুসারে ভাষা এবং ভাবের ব্যবহার করা হয় না। আর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল এই যে, আমাদের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য ও সদুপদেশ শিক্ষা দেবার ঝোঁক বেশী; সাহিত্যরস পরিবেশনের আয়োজন কম। বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তকগুলি বিচার করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

বিদ্যালয়ে কয়েকটি পুস্তক পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয় কেন? পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি মুখস্থ করলেই কি ভাষা শেখা কিংবা সাহিত্যের রস উপলব্ধি করা যায়? তাহলে সাহিত্য পাঠ তো খুব সহজ হত! পাঠ্য হিসাবে কয়েকটি বই নির্দিষ্ট করবার উদ্দেশ্য হল শিক্ষক সে সব বই পড়িয়ে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বাইরে পরবর্তী জীবনে স্বাধীনভাবে সাহিত্য-পাঠের পন্থতি নির্দেশ করবেন। পাঠ্যপুস্তক পড়ানো অনেকটা গণিতের 'ওয়ার্কড আউট এগ্‌জাম্‌প্‌লের' মতো। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট থেকে বই কি করে পড়তে হয় তার দৃষ্টান্ত পেলে পরবর্তী জীবনে সাহিত্য পাঠ সার্থক হয়; স্বাধীনভাবে বই পড়ে পরিপূর্ণরূপে সাহিত্যের রস আস্বাদন করা সহজ হয়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক পড়বার এবং পড়াবার এই মূল উদ্দেশ্য আমরা সকলেই ভুলে গেছি। এখন সাহিত্য পাঠ পরীক্ষা পাশের উপায় মাত্র। পরীক্ষা পাশের ক্ষেত্রেও সাহিত্য প্রধান নয়। পাঠক্রমে বাংলার স্থান অপ্রধান। উচ্চ মানের পাঠক্রমে বাংলা অপেক্ষা ইংরাজীর প্রাধান্য বেশী। সাহিত্যের জন্য যেটুকু সময় দেওয়া সম্ভব তার অধিকাংশ বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য পাঠের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। কি বাংলা, কি ইংরেজী—কোনো সাহিত্যই সুষ্ঠু-রূপে পড়ানো হতে পারে না।

পূর্বেই বলেছি, উপযুক্ত মানের পুস্তক নির্বাচন করা না হলে শিক্ষার্থীর মন বইয়ের প্রতি কখনো আকৃষ্ট হবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন জাতের বই প্রয়োজন। বারো চৌদ্দ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইয়ে জীবনের আনন্দের দিকটাই প্রাধান্য লাভ করবে। বেদনা এবং আবেগময়তা এ জাতীয় পুস্তকের উপযোগী নয়। ভাষা অবশ্যই সহজ হবে। এই শ্রেণীর উদ্দেশ্যে নির্বাচিত কবিতা হবে সঙ্গীতধর্মী। নাটক এদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ পড়ে উপভোগ করবার জন্য যে কল্পনার বিস্তার আবশ্যক এই বয়সের শিক্ষার্থীদের তা থাকে না।

উচ্চতর শ্রেণীতে প্রধানতঃ তিন প্রকারের সাহিত্যগ্রন্থ পড়ানো হয়ে থাকে—কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। প্রবন্ধ-সাহিত্য তথ্যমূলক; শিক্ষার্থীরা প্রবন্ধ যে শুধু পড়ে তাই নয়; প্রবন্ধ লেখা তাদের অভ্যাসও করতে হয়। প্রবন্ধের পাঠনা এই জন্য সহজ। কাব্য ও উপন্যাস পড়াবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার্থীর জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা নেই; তার কল্পনাশক্তির এমন প্রাথর্য নেই যাতে পরিবেশ ও অনুভূতি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর কল্পনা উদ্দীপ্ত করতে হবে এবং তার অভিজ্ঞতার পরিধিকে প্রসারিত করতে করতে হবে। কাব্য পাঠনায় আঙ্গিকের শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরও কাব্যের গঠনরীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা কমই আছে। কাব্য উপভোগের পক্ষে আঙ্গিক সম্বন্ধে অজ্ঞতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

চরিত্রগঠনের জন্য ভালো উপন্যাসের পাঠনা ফলপ্রদ হতে পারে। কিন্তু আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় উপন্যাসের স্থান নগণ্য। উপন্যাস সম্বন্ধে হ্যাজলিট যা

বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য : "It makes familiar with the world of men and women, records their actions, assigns their motives, exhibits their whims, characterizes their pursuits in all their singular and endless variety, ridicules their absurdities, exposes their inconsistencies....shows us what we are, and what we are not; plays the whole game of human life over before us, and by making us enlightened spectators of its many-coloured scenes, enables us (if possible) to become tolerably reasonable agents in which we have to perform a part".

শিল্প-কলার দিক থেকে উপন্যাসের স্থান হয়ত কাব্যের নীচে কিন্তু জীবনে উপন্যাসের প্রভাব বেশী। ভার্নন লী এই কথাটি সুন্দর করে বলেছেন : "The novel has less value in art, but more importance in life. Emotional and scientific art....trains us to feel and comprehend—that is to say, to live....The novelists have, by playing upon our emotions, immensely increased the sensitiveness, the richness, of this living keyboard".

পাঠনার উপরে নির্ভর করে সাহিত্য জীবন-গঠনে কতটা সহায়তা করবে। আমাদের দেশে শিক্ষক প্রায়ই ক্লাশে সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন; শিক্ষার্থীর জীবনের সহিত সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপন করে দেবার চেষ্টা করা হয় না। আর সাহিত্য পাঠনার সবচেয়ে বড় অন্তরায় রস ও সৌন্দর্য অপেক্ষা তত্ত্বকে বড় করে দেখবার মনোবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত যে সব সমালোচনা গ্রন্থ আছে তাদের বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে রসোপলব্ধির চেয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি বড়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট গুরুদেব, ঋষি অথবা দার্শনিক; সৌন্দর্যসাধক হিসাবে সহজভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে আমাদের দ্বিধা বোধ হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠনার ফলে সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পায়।

পাঠক্রমে সাহিত্য যথার্থ মর্যাদা লাভ করলে এবং যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে পড়াবার ব্যবস্থা থাকলে জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে তা অনুকূল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য রচনা

রথীন্দ্রনাথ রায়

যাঁদের সাহিত্যসাধনা প্রধানত প্রবন্ধের উপরেই নির্ভরশীল, তাঁদের খ্যাতিলাভের অন্তরায় একাধিক। প্রবন্ধ যদি একটু গবেষণাধর্মী হয়, তা হলে তো কোনো কথাই নেই; 'আকাডেমিক' বিশেষণ দিয়ে তাকে অন্তাজ শ্রেণীভুক্ত করে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়। আবার এর বিপরীত ব্যাপারও কম ঘটে না। প্রবন্ধটির সাহিত্যিক গুণ ও রচনারীতির মনোহারিত্ব থাকলেও রক্ষা নেই—অধুনা বহুনিন্দিত 'রম্যরচনা' শব্দটি দিয়ে একে বিশেষিত করা হয়! কখনো কখনো এইসব লেখকদের 'জার্নালিজম' করার অপবাদও রটে! তা ছাড়া কথাসাহিত্যের গল্পরস এখানে নেই, তাই পাঠকও মুষ্টিমেয়। তাই প্রবন্ধ লেখকদের অধিকাংশই শ্রুতি স্মৃতিতে পর্যবসিত হন। শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখকদেরই এই দশা! আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেণীর রচনাবলী পড়তে গিয়ে, প্রবন্ধকারদের এই দুর্ভাগ্যের কথাই আবার নূতনভাবে মনে জেগে উঠল। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে (১৯১৯) রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষাদীপ্ত রচনাবলী বিস্মৃতির পর্যায়ে পেঁছেছে। সম্ভবত, এর একটি প্রধান কারণ হল এই যে তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধই দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত। কিন্তু রামেন্দ্র-রচনাবলীর যে কোনো শ্রদ্ধাবান পাঠকই স্বীকার করবেন যে, গদ্যরীতির প্রসাদগুণে ও সরসতায় রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত দুরূহ ও গবেষণাধর্মী বিষয়কেও সুখপাঠ্য ও সাহিত্য গুণসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যকৃতি আর একটি বিশেষ কারণেও স্মরণীয়। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের রূপ ও রীতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে রামেন্দ্রসুন্দর এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী যার এক কোটিতে আছে যুগন্ধর বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনার স্বর্ণশস্য, আর এক কোটিতে আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ। উনবিংশ শতাব্দিতে বাঙালীর অভিনব মানস-পিপাসা যেমন আখ্যায়িকাকাব্যে ও গীতিকাব্যে তার বিচিত্র স্বপ্নসাধ প্রসারিত করেছিল, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুদ্ধিমার্জিত অনুশীলন এই যুগের গদ্যকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। এই যুগের গদ্যরচয়িতাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে রামেন্দ্রসুন্দর ধন্য হয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত সম্পর্কে বলেছেন :

"নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক-পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না; বেনামিতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধলেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজ নামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল। সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমার গুরুমহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব। ২

উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিশীলিত প্রবন্ধ সাহিত্যের যে বিচিত্র অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা তারই সঙ্গে এক আত্মিক যোগসূত্রে আবদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয় কুমার, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ প্রমুখ গদ্যলেখকেরা তাঁদের জীবনের এক একটি 'মিশন'কেই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমন্বয় করে তাঁরা যে সারস্বত-

সাধনার ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাকেই ঐশ্বর্যদীপ্ত করে তুলেছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের বাঙালীরই শেষ বংশধর। তাই তাঁর কর্মে, চিন্তায় ও জীবনাদর্শে গত শতাব্দীর চিন্তানায়কদের হৃদয়োৎকন্ঠাই স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র পত্র-সূচনায় লিখিয়াছিলেন ঃ 'ইংরাজি লেখক, ইংরাজিবাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।' রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

তবু সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরকে সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমযুগের প্রতিনিধি মনে করাও ঠিক হবে না। প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমযুগ ও রবীন্দ্রযুগের মধ্যে এক সেতু রচনা করেছেন। বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধলেখকদের দৃষ্টি ছিল প্রধানত গবেষণামুখী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের চর্চা করে তাঁরা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিষয়নিষ্ঠা ও মননশীলতা এই যুগের প্রবন্ধের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। রচনারীতির রমণীয়তা ও লাবণ্যের চেয়েও বক্তব্যের দিকেই এই যুগের প্রবন্ধকারদের অধিকতর প্রবণতা। রবীন্দ্রযুগে বাংলা প্রবন্ধের রূপ ও রীতির পরিবর্তন লক্ষণীয়। বক্তব্যকে হৃদয়ের বর্ণে রঞ্জিত করে তাকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করাই হল এ যুগের প্রবন্ধাবলীর মৌলিকধর্ম। রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধাবলীতে পরিণততর গদ্যরীতির স্বাক্ষর বিদ্যমান।

শুধু কালানুক্রমিকতার দিক থেকেই নয়, মনোধর্মের দিক থেকেও প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর এই দুই পর্বের এক মহৎ সমন্বয়। বিশুদ্ধ প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে সম্ভবত আর কেউ এমন অবলীলাক্রমে এই দুটি পর্বের সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। দুঃসাধ্য গবেষণাকে যেমন তিনি নির্ধূম আলোকরেখায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন, তেমনি রমণীয়তার নামে তিনি অর্থহীন কথার ফুলঝুরি বর্ষণ করেন নি। জীবনে ও চরিত্রে তিনি যে ভারসাম্যে অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন তাঁর সাহিত্যকর্মও সেই ব্যক্তিত্বের আলোকেই সমুজ্জ্বল। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক-জীবন একই বিধাতার রচনা!

২

অদীর্ঘায়ু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবৈচিত্র্য কম নয়। তাঁর প্রবন্ধগুলি তাঁর গভীরাশ্রয়ী মন ও মননশীলতার বাহন। পাণ্ডিত্যের বহুমুখী বিস্তার ও গভীরতা যে কোনো দুরূহ বিষয়কেই অতি সহজে আয়ত্ত করেছে। তাঁর অন্তর্ভেদী ঋজুদৃষ্টি বিষয়ের নিগূঢ় অন্তস্থল থেকে সত্যকে আবিষ্কার করেছে। অথচ এই সুগভীর বিদ্যাবত্তা তাঁর হৃদয়কে শুষ্ক করে তোলে নি—সজীব ও সরস মনের স্পর্শে বরং বিদ্যার সঞ্চিত সম্পদ তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। নব্য ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতীয় দর্শন, ব্যকরণ -ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান; সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ের উপরেই তাঁর সৃজনধর্মী মনের স্নিগ্ধজ্যোতি বিকীর্ণ হয়েছে, তা তখনই একটি সুকুমার পুষ্পস্তবকের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাধৃত বহুমুখী পাণ্ডিত্য বিস্ময়কর, কিছু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঐক্যসূত্রটি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর মনোজীবন কেমন সুসঙ্গত ও পরিপাটি ভাবে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষার ফলেই তিনি নিতান্ত বাল্যবয়সেই বিজ্ঞানের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। পদার্থবিদ্যায় ও

১ অম্ল-মধুর ঃ ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩

রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বিজ্ঞান শুধু তাঁর পাঠ্যাবস্থার প্রধান বিষয়ই ছিল না, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখক হিসেবেই তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করেন। 'নবজীবন' পত্রিকায় তিনি যে কয়টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্পর্কিত। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে সহজে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন।[২] মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি 'পপুলার সায়েন্স' রচনার পথকেই প্রশস্ত করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের আগে বাংলা ভাষায় যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচিত হয় নি, এমন কথা নয়। ফেলিক্স কেরি থেকে শুরু করে আচার্য জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত কোনো কোনো লেখক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তিনি নানাভাবে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া 'পপুলার সায়েন্স' শব্দটির শ্রেষ্ঠ-লক্ষণসমূহ তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। একালে 'পপুলার সায়েন্স' শব্দটি শুনে কেউ কেউ নাসিকাকুঞ্চিত করতে পারেন, কেউ কেউ এই জাতীয় রচনায় বিষয়ের মহিমা খর্ব হওয়ার আশঙ্কাও করেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্পর্কে এই শ্রেণীর আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। তাঁর গভীরাশ্রয়ী মন বিষয়ের মর্যাদাকে কখনো লঘু করেন নি, অথচ কত সহজে তিনি কত গভীর কথা বলেছেন! এর কারণ হল তাঁর সরস রচনারীতির অনায়াস-সাবলীলতা! বিদ্যাকে যেমন সহজে তিনি আয়ত্ত করেছেন, তেমনি সহজে তিনি পরিবেশন করেছেন। বিদ্যা তাই দুর্বহ বোঝা না হয়ে তাঁর অভিজাত মনের সহজাত অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে। তাই তাঁর রচনা পড়ে কোনো সমালোচকের মনে পড়েছে 'আচার্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী'র কথা।[৩]

রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারার দ্বিতীয় স্তরে একটি গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরের প্রবন্ধাবলীতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনবিজ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি নিপুণ বিশ্লেষণের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'জিজ্ঞাসা'র "প্রতীত্যসমুৎপাদ" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 'এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একটা ফিজিওলজির বা জীবনবিদ্যার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক এম্ব্রায়োলজি বা ভ্রূণবিদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত জীবনতত্ত্ব স্বীকার করিবে কিনা, জানি না; কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীরতত্ত্বের আবিষ্কারে মার মহাশয়ের ততদূর ভয় পাইবার দরকার ছিল না এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্যেরা সকলে স্বীকার করেন না।'

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাবত্তাকে যাচাই করে নিতে হলে ভারতীয় দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও শাস্ত্রাদির গভীরে প্রবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এই তুলনামূলক বিচার পদ্ধতিকে পূর্ণতর করার জন্য বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় বিদ্যা তিনি অসাধারণ

২ রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন ঃ 'গত কয়েক বৎসরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্যসাধনের চেষ্টা; সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না।'

৩ 'সত্যনিষ্ঠায় কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরলতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এগুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।'— অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (দ্বিতীয় সং), পৃ ৫৪

অধ্যবসায়ের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন।[৪] এই অধ্যয়নের ফল রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি। প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি অবিমিশ্রভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ—নব্য বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি মাতৃভাষায় সহজভাবে প্রকাশ করার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে লেখকের মৌলিক চিন্তা প্রখরতর হয়েছে, বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের চমকপ্রদ নৈপুণ্য বিস্মিত করে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে প্রাচীন দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু তাই বলে এ দুয়ের সমন্বয়ও সম্ভব নয়। তাঁর এই সিদ্ধান্তটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"আমার বিবেচনায় যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় করিতে যান, তাঁহারা একটি ভুল করেন। বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরিবর্তনশীল; উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোনদিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া লইবে।.... ....কাজেই আজি যদি প্রাচীন মতে ও আধুনিক মতে সমন্বয় করিয়া আনন্দ লাভ কর, কালি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।.....প্রাচীন দার্শনিক মতের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের মতের কোন বিরোধ নাই, এ কথাও ঠিক। কিন্তু প্রাচীন মতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে গেলে ওরূপে সমন্বয় করিতে গেলে চলিবে না।"[৫]

জীবনের শেষদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তা-চেতনা ও ভাবসাধনা চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করে। এই তৃতীয় পর্যায়ের রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর মূলত দার্শনিক। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, শাস্ত্র-পুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তিনি এক সৃষ্টিরহস্যভেদকারী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী তাঁর মৃত্যুর পরে 'বিচিত্র জগৎ' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি তাঁর এই আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করতে পারেন নি। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের কল্পিত প্রাতিভাসিক জগৎ এবং পারমার্থিক জগতের সম্পর্ক কি, তা তিনি নিপুণ বিশ্লেষণ, সম্মার্জিত বুদ্ধি ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তুলেছেন। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রজ্ঞার একটি, বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাহ্য জগতের সঙ্গে পারমার্থিক সত্যের সম্পর্ক নির্ণয় ও যোগসূত্র বিচারের প্রচেষ্টা দর্শনশাস্ত্রের এক সুপ্রাচীন অভিপ্রায়। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বৈজ্ঞানিক। তাই তাঁর কাছে বাহ্য জগৎ ও পরমার্থিক সত্যের মাঝখানে এক বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগৎ এসে পড়েছে। তাই সমস্যাটি জটিলতর হয়ে উঠেছে। 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর এই দুরূহ সমস্যাটিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন।

'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'যজ্ঞকথা' প্রভৃতি পরিণত বয়সের প্রবন্ধসঙ্কলনগুলির মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিয়েই তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে দার্শনিক প্রবন্ধাবলীতে। তাঁর সমগ্র ভাবজীবনের অভিপ্রায় সম্পর্কে হার্বার্ট স্পেন্সারের একটি উক্তি

৪. 'বাঙ্গালার কোন এক বড় মনীষী একবার বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রবাবু সায়েন্সেই খুব বড় পণ্ডিত, শাস্ত্রকথা তিনি কতটুকু জানেন? এইটুকু রামেন্দর কানে যায়। তারপর সাতবৎসরকাল রামেন্দ্র যেরূপ অপূর্ব অধ্যবসায়ের সহিত বেদ-বেদান্ত, তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।'

৫ পঞ্চভূত ঃ জিজ্ঞাসা

মনে পড়েঃ 'Knowledge of the lowest kind is *un-unified* knowledge; Science is *partially-unified* knowledge; Philosophy is *completely unified* knowledge'. রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়—এ ক্ষেত্রে দর্শন যেন বিজ্ঞানেরই প্রভাবিক পরিণতি। দর্শন-বিজ্ঞানের এই সেতুবন্ধন কোথাও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। চিন্তার মৌলিকতা ছাড়াও প্রবন্ধগুলির সরস বর্ণনাভঙ্গি ও লাবণ্যমন্ডিত গদ্যরীতি সাহিত্যিক গুণে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক গভীরতাকে সাহিত্যের অমৃত রসে পরিণত করার দুর্লভ শিল্পকুশলতা তাঁর ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই তিনি অক্ষয় সম্পদ রেখে গিয়েছেন।

৩

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬)। এই গ্রন্থে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক মূল সত্যকে সহজ করে বলেছেন। দুরূহ বিষয়কে সহজ ও সুখপাঠ্য করে তোলা সাধারণ শক্তির পরিচায়ক নয়। প্রথমত, বিষয়বস্তুর উপর অসাধারণ অধিকার থাকা চাই, কিন্তু দুরূহকে সরস ও সহজ করতে হলে ঐ অধিকারই যথেষ্ট নয়, রচনাশক্তির জাদু চাই। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় এই দ্বিবিধ শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রকৃতি' গ্রন্থটিতে রামেন্দ্রসুন্দর ইউরোপের খ্যাতনামা বিজ্ঞানসাধকদের মতামতই পরিবেশন করেছেন। ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্মহোল্টস, ল্যাপ্লাস প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্যদের প্রদর্শিত পথেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের মতামতকে তিনি ঘরোয়া উপমা দিয়ে সহজ কথোপকথনের ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেনঃ

'আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, অতএব অন্যালোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূখণ্ডটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙিয়া চূড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাডস্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনের পরিবর্তে আইরিশ হোমরুল লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।'

'প্রকৃতি' গ্রন্থটিতে বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা আছে। একে 'পপুলার সায়েন্স' বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানই যে চরম সত্য নয়, এ সংশয়ও তাঁর মনে জেগেছে। এই গ্রন্থের 'জ্ঞানের সীমানা' ও 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধ দুটিতে এই সংশয় তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অব্যাহত জয়যাত্রা স্মরণ করেও বিজ্ঞান চরম সত্যের সম্মুখীন করে কিনা, এ বিষয় তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নচঞ্চল উৎকণ্ঠাই তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'র (১৯০৪) ভিত্তিভূমি। বিজ্ঞানকে সহজভাবে পরিবেশন করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এমন কথা বলেছেন যা তাঁর গভীরাশ্রয়ী ভাবুকতারই পরিচয় দেয়। শুধু প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তই নয়, প্রকৃতির অপ্রত্যক্ষ ও অব্যক্ত রূপও তাঁর সম্মুখে এক অভূতপূর্ব রহস্যরসে মণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছেঃ

আমি এই পর্যন্ত বলিতে চাই যে, সমস্ত ব্যক্ত প্রকৃতির চিত্রের খানিকটার উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া আছে; সেইটা আমাদের বর্তমানে প্রত্যক্ষ অংশ। সেই উজ্জ্বলদীপ্ত প্রদেশের চারিপাশে ক্ষীণতর আলোক, আধ আলোকে আধ আঁধারে, আরও খানিকটা প্রদেশ ঈষৎ অপরিস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে; সেই প্রদেশটা বর্তমানে প্রত্যক্ষ নহে; তাহার খানিকটার নাম অতীত, খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ; খানিকটা দূরগত ও দর্শনাতীত; আর খানিকটা সূক্ষ্ম বা

৬ প্রলয় ঃ প্রকৃতি

অতীন্দ্রিয়; খানিকটার নাম স্মৃতি শ্রুতি; খানিকটার নাম অনুমান, কল্পনা ও স্বপ্ন; ও আর খানিকটার নাম আশা ও ভয়।[৭]

রামেন্দ্রসুন্দরের গভীরাশ্রয়ী জিজ্ঞাসা তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে ক্রমশই অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। তাঁর শেষ দশবছরের রচনাবলীতে চিন্তার অধিকতর স্বচ্ছতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময় তিনি বৈদিক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, 'যজ্ঞকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর পরিণততম চিন্তাশক্তির পরিচয় বহন করে।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর জিজ্ঞাসা গ্রন্থটি তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব গোবিন্দসুন্দরকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গপত্রটির মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরাত্মা ধ্বনিত হয়ে উঠেছেঃ

'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্তসংকুল জগৎপ্রবাহের উপরের স্তরে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠে, বুঝিতে পারি; জগন্নিয়ন্তারক কোন নিয়মে তাহা স্বকার্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বুদ্বুদের মত অন্তর্হিত হয়, তাহা বুঝিলাম না।.... ...জীবনদাতা পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্তিভেদ। ত্বৎপ্রদত্ত সম্বল ত্বদীয় চরণোপ্রান্তে উৎসর্গ করিলাম।'

'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলিকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 'জিজ্ঞাসা' রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাজগতের এক সন্ধিলগ্ন। বিজ্ঞান থেকে কেমনভাবে তিনি দর্শনের সীমায় পদক্ষেপ করেছেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। 'উত্তাপের অপচয়', 'নিয়মের রাজত্ব' জাতীয় প্রবন্ধে সহজ-সুন্দর ভাবে বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিকে পরিবেশন করেছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'প্রকৃতি'-র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির একটি যেমন নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে, তেমনি দার্শনিক রহস্যজিজ্ঞাসাও তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। 'সুখ না দুঃখ?', 'সত্য', "জগতের অস্তিত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি দর্শনের অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মতো দার্শনিক প্রবন্ধেও তিনি যতদূর সম্ভব পারিভাষিক শব্দ বর্জন করে দুরূহ সমস্যার গ্রন্থিমোচন করার চেষ্টা করেছেন। 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধ দুটিকে নন্দনতত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি জীববিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও দর্শন, তিন দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। সৌন্দর্য বস্তুধর্ম না চিত্তধর্ম, নন্দনতত্ত্বের সেই নিগূঢ় বিষয় নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের আগে বাংলা ভাষায় সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে এমন বিশ্লেষণী আলোচনা আর কেহই করেন নি। অথচ তাঁর আলোচনা যে কত অবলীলাকৃত ও স্বচ্ছন্দ-সুন্দর তা একটি উদাহরণ দিলেই পরিস্ফুট হবেঃ

'নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মত বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার করধৃত লীলা-কমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলবর্তী হইতে কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত নহি।

'প্রতীত্যসমুৎপাদ', "পঞ্চভূত" প্রভৃতি প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞান, দুইই জগৎরহস্য উদঘাটন করতে চায়, কিন্তু

৭. প্রকৃতির মূর্তি ঃ প্রকৃতি
৮. সৌন্দর্য-তত্ত্ব ঃ জিজ্ঞাসা

তাদের পথ স্বতন্ত্র। তাই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেনঃ

"বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই জাগতিক রহস্যঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হইতে দার্শনিক অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। দার্শনিক সৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সহিত মিলাইতে গেলে চলিবে না।'[৯]

দর্শন ও বিজ্ঞানের এই স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে যুক্তিক্রম, বিচারবুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। বিজ্ঞান তাঁকে যুক্তিবাদী করে তুলেছিল, আর দর্শন দিয়েছিল ভাবগভীরতা। এই দুয়ের দুর্লভ সমন্বয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ রামেন্দ্রসুন্দর জগৎ রহস্যের জটিল গ্রন্থী মোচন করেছেন। জ্ঞানপিপাসু রামেন্দ্রসুন্দর এই-ভাবেই চিন্তাজগতের লতাগুল্মশাখা জটিল পথে অগ্রসর হয়েছেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। সামান্য আলো পেয়ে আরো দূরে এগিয়ে গিয়েছেন। যেখানে পথ একেবারেই মেলে না, সেখানেও বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানের শিখাকে প্রদীপ্ত করতে ভোলেন নি। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই যে তাঁর প্রসন্নতা নিষ্প্রভ হয় নি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল এর প্রসাদ-গুণসমন্বিত সুমার্জিত রচনারীতি। পাণ্ডিত্য ও সুগভীর বিদ্যাবত্তা যথোপযুক্ত রসদৃষ্টির অভাবে নীরস হয়ে উঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলিতে শিল্পীমনের অমৃত প্রসাদ বর্ষিত হয়েছে।

৪

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বঙ্গানুবাদ (১৯১১) রামেন্দ্রসুন্দরের প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জীবনের এক মহৎ কীর্তি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভারত-শাস্ত্র-পিটক নামে বৈদিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর উক্ত গ্রন্থমালা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রামেন্দ্রসুন্দরকৃত অনুবাদ ঐ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। বহুদিন আগে মার্টিন হোগ ইংরেজিতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ অনুবাদ রামেন্দ্রসুন্দরের মনঃপূত হয় নি। তাই তিনি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। তিনি মূলত সায়ণাচার্যের মতই গ্রহণ করেছেন। এই দুর্জ্ঞেয় বিষয় অনুবাদ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর শুধু ভাষান্তরিত করেই ক্ষান্ত হন নি, বিষয়ের মর্মমূলে প্রবেশ করার জন্য দুঃসাধ্য সাধনা করেছিলেন। লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের স্বরূপ পরিস্ফুট করার জন্য তিনি প্রচুর পরিমাণ টীকা সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থের শেষে পারিভাষিক শব্দগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছেন। ভারতবর্ষের 'পুরাতনী বিদ্যা'র প্রতি তাঁর প্রীতি ও সশ্রদ্ধ মনোভাবই তাঁকে এই দুঃসাধ্য ব্রত-পালনে উদ্বুদ্ধ করেছিলঃ

'বেদবিদ্যা অল্পজ্ঞকে ভয় করেন; কিন্তু আমার মত অজ্ঞের হাতে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। বেদবিদ্যায় আমি তখন সর্বতোভাবে অজ্ঞ ছিলাম। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতাই আমাকে এই ভারগ্রহণে প্রোৎসাহিত ও প্রেরিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া ভারতবর্ষের পুরাতনী বিদ্যায় অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্য-হীনতার লক্ষণ বলিয়া বোধ করিতাম। এই সুযোগ অবলম্বনে সেই মহতী বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই নাই। এই প্রাংশুলভ্য ফলের লোভেই আমি উদ্বাহু বামনের বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিলাম।'[১০]

৯. প্রতীত্যসমুৎপাদ ঃ জিজ্ঞাসা
১০. নিবেদন ঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

'কর্মকথা' (১৯১৩) একখানি সংকলন গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলি নানা সময় বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'—এই মহৎ উক্তিটিই তাঁর এই বিচ্ছিন্ন রচনাগুলিকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। এই সংকলনটির মধ্যে সর্বশেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞ' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর একটি মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে বিরোধের কথা অনেক তত্ত্বদর্শী পন্ডিত উল্লেখ করেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর সেই বিরোধের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ডয়সেন তাঁর 'ফিলজফি অব্ দি উপনিষদস্' গ্রন্থের শেষভাগে বেদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ কল্পনা করেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ভগবৎ গীতার মধ্যেই এই দুয়ের মূলগত ঐক্যের কথা বলা হয়েছে—এই সমন্বয়ের সাধনাই গীতার শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য।

'কর্মকথা'র কোনো কোনো প্রবন্ধে বৈরাগ্যের উপর কটাক্ষ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখক উক্ত গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বেদ-পন্থী সমাজের সমাজবন্ধনের মূলে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে তার উপরেও তিনি আলোকপাত করেছেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও খ্রীস্টান সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বৈরাগ্যের মধ্যে যে অনেক ক্ষেত্রেই আত্ম-পরায়ণতা এ কথা উল্লেখ করতেও তিনি বিস্মৃত হন নি। কর্মকথার 'নিবেদন' অংশে তিনি বলেছেন ঃ

'ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থপরতা হইতে যে বৈরাগ্যের জন্ম, যদ্দ্বারা মানুষে জীবনের ভার গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়, সেই বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের ধর্মশাস্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেন নাই এবং সেইজন্যই গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয়েছেন।...বেদপন্থী সমাজের সমাজবন্ধনের একটা নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে পাওয়া যায়।'

'কর্মকথা' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর বেদপন্থী সমাজের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত করেছেন। তিনি এই গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করেছেন যে, মানুষ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কর্মত্যাগের কোনো অধিকার তাঁর নেই।

প্রজ্ঞাসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানগরিষ্ঠ সাধনার বিস্ময়কর নিদর্শন আছে তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪) গ্রন্থটিতে। রামেন্দ্রসুন্দর তখন অসুস্থ। রোগশয্যায় তিনি যে সমস্ত দুরূহ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলেন, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত তা লিপিবদ্ধ করেন। রামেন্দ্র-সুন্দরের মৃত্যুর পর বিপিনবিহারী বলেছিলেন ঃ

"ভারতবর্ষের পুরাতন 'ফাইল' যাঁরা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া তিনি সভ্য মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্মকথাটুকু বলিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর, হিব্রু, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে হইবে, এই বাসনা তাঁহার ছিল; কিন্তু মধ্যপথে হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন।" [১১]

'বিচিত্র প্রসঙ্গ' গ্রন্থটিতে রামেন্দ্রসুন্দরের বহুমুখী জ্ঞানসাধনা ও মননশীলতা বিচিত্র বিষয় আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। পরিণত বয়সে জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা তাঁর মনে যে একটি আত্মস্থ ও অচঞ্চল মহাসমুদ্রের সৃষ্টি করেছিল, সেখান থেকে জ্ঞানের কোনো একটি বিশেষ শাখাকে পৃথক করে দেখার উপায় ছিল না। তাই রোগশয্যায় যখন তিনি অধ্যাপক বিপিনবিহারীর সঙ্গে

১১. নলিনীরঞ্জন পন্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (২য় সং) পৃ ৭২

আলোচনা করতে গিয়ে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেছেন—বিশ্ববিদ্যা যেন তাঁর কণ্ঠে। রোগজর্জর দেহেও তাই তিনি বিশ্ববিদ্যার বিচিত্র তীর্থভূমি পরিক্রমা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর দীর্ঘকাল ব্যাপী মন তৈরি করেছিলেন। বিদ্যার বিচিত্ররসকে গ্রহণ করার মতো শোষণ শক্তি তাঁর ছিল, অথচ বিনা বিচারে কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করেন নি। বিজ্ঞান, দর্শন, তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, তুলনামূলক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সভ্যতার ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের রসায়নে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পটভূমি রচিত হয়েছে। গ্রন্থ শেষে প্রাচীন হিব্রুজাতির একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। রামায়ণ ও মহাভারতকে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি ভারত ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। অনেক নূতন কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু সুলভ চাকচিক্যের দ্বারা চমক সৃষ্টি করতে চান নি। [১২] মানব সভ্যতার ইতিহাস যে তাঁর নখদর্পণে ছিল, এই গ্রন্থটি তারই পরিচয় দেয়।

৫

রামেন্দ্রসুন্দর স্বল্পায়ু ছিলেন। তা ছাড়া, শেষ জীবনে অপটু দেহের জন্য লেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। তবু তাঁর রচনার পরিধি খুব কম নয়, আবার বিষয়ের গুরুত্ব সেই পরিধিকেও অতিক্রম করেছিল। তাঁর মানসপ্রকৃতিই ছিল গভীর, বস্তুর নিগূঢ় রহস্য ভেদ করার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। তাই যখন যে বিষয়ের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন, তখনই তা সজীব হয়ে উঠেছে—বেদবিদ্যা থেকে আরম্ভ করে সমকালীন দেশ-কাল কোনো বিষয়ই সেখানে বাদ পড়ে নি।

'চরিতকথা' (১৯১৩) গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধের নীচে চাপা পড়ে আছে। প্রকাশের পর থেকে এর কোনো সংস্করণও হয় নি। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থেও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার বিশিষ্টতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। 'চরিতকথা'তে "পোর্ট্রেয়িট" জাতীয় রচনার সংকলন বলা যায়। বিভিন্ন সময় রচিত আট জন মনীষীর জীবনচরিত এখানে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলা যায় না। ইতিবৃত্তমূলক পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। জীবনী থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা নিয়ে তিনি বিদ্যা-সাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর জীবনালেখ্য রচনা করেছেন।

"চরিতকথা"র 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগর চরিতের উপর নূতন আলোক-পাত করেছে। বিদ্যাসাগর চরিত নিয়ে অনেকেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্র-নাথের বিদ্যাসাগর সম্পর্কেই প্রবন্ধ ছাড়া মৌলিকতায় ও সাহিত্যগুণে আর কোনো প্রবন্ধ এর সমকক্ষ নয়। কয়েকটি মূলসূত্রের সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরচরিতের অন্তরতম রূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। বিদ্যাসাগর চরিতের উন্নতোজ্জ্বল মূর্তি তিনি যেভাবে রচনা করেছেন, তার মৌলিকতা ও নিপুণতায় বিস্মিত হতে হয় ঃ

'অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড়

১২. 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' পুস্তকে আপনার কথাগুলি পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। কথাগুলি নিরভিমান পান্ডিত্যপূর্ণ এবং নিশ্চল চিন্তাশীলতাব্যঞ্জক। তাহার মধ্যে নূতন কথা অনেক আছে, কিন্তু তাহা নূতনত্বের চাকচিক্যরঞ্জিত নহে।'—

[—রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি। আশুতোষ বাজপেয়ী রচিত 'রামেন্দ্র-সুন্দর' গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত]

জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ যন্ত্র একথানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।'

'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মৌলিক অভিপ্রায়কে নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসা কিরূপে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জয়যুক্ত হয়েছে, তা তিনি বাকপরিমিতি ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। যথার্থ কবিদৃষ্টির স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'সৌন্দর্যের প্রকারভেদ আছে; গাছ-পালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎসংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথম শ্রেণীর কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না; সেটা দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের ও ধর্মতত্ত্ববিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেই রকম গোড়ার কথা দুই-একটা সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে; এইজন্য কবির আসনে তাহার স্থান অতি উচ্চে।'

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপনের নাম জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই জীবনেরই কবি-ব্যাখ্যাতা। প্রবন্ধটির শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে যে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন, তা 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যার একটি নূতন সংকেত, সন্দেহ নেই। প্রবন্ধকারের মতে "আনন্দমঠে" ও "কৃষ্ণচরিত্রে" যুগধর্মের আবশ্যকতার কথাই নির্দেশ করা হয়েছে। কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন ঃ

'বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত-সাগর মন্থন করিয়া যে মূর্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম প্রবর্তনের মূর্তি, তাহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপকের মূর্তি—ধর্মের সহিত অধর্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্র রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্তি; জীবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতকর্দমে দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্তি।'

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে সাহিত্য ও ধর্মের সম্পর্ক আমাদের দেশে যে অবিচ্ছেদ্য, সেই তত্ত্বটিকে নির্ণয় করে লেখক সেই আলোকে মহর্ষির জীবনাদর্শকে বিচার করেছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' সমালোচক রামেন্দ্রসুন্দরের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দেয়। এই সূত্রসংক্ষিপ্ত সুমিতবাক প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন্দ্রনাথের কবিমানস ও গদ্যরীতির মর্মরহস্যকে যেভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন, তা ভাবীকালের বলেন্দ্র-সমালোচকদের মূল্যবান পথনির্দেশ দিয়েছে। 'চরিতকথা'র প্রবন্ধগুলির পিছনে সাময়িকতার তাগিদ ছিল, কিন্তু সাময়িকতার ঊর্ধ্বে আজ চিরন্তন রসসাহিত্য হিসাবেই এর সর্বজনস্বীকৃত আবেদন।

'নানাকথা' (১৯২৪) গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ ও সমকালীন রাজনৈতিক জীবন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সুকঠোর যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি ও সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ প্রবন্ধ-

গুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁর বুদ্ধিধর্মী মনের তীক্ষ্ণতা প্রকাশিত হয়েছে। আবার সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি কতকগুলি অবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি। তিনি তাঁর নিজের দেশের পটভূমিকায় সমস্যা সমাধানের বাস্তব প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মূল্য আজো কমে নি। রামেন্দ্রসুন্দর কোনো সমকালীন সমস্যাকেই বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাকে তিনি বৃহত্তর জীবনের পটভূমিকায় অখণ্ডভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই সংকলনের অন্তর্গত 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধটিতে সাহিত্যসমালোচক রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় মহাকাব্য সম্পর্কে এমন সুলিখিত প্রবন্ধ আর নেই।

বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সারস্বত-সাধনার প্রতি গভীর প্রীতিবোধ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাধ্যমে বাঙালীর সারস্বত-সাধনাকে তিনি নবীন মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে ১৩১৪ সালের ১৭ই-১৮ই কার্তিক কাশিমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। এই সম্মিলনে পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর যে রচনাটি পাঠ করেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ঃ

'যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।.....যেদিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা পূর্ণ হয় নাই; আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব।'[১২]

রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ শুধু হৃদয়াবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি তাকে নানাভাবে কর্মরূপে দিয়েছিলেন। তিনি হাতে-কলমে করার লোক ছিলেন। "শব্দকথা" (১৯১৭) গ্রন্থটি থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একান্ত অভাব দেখে, তিনি সেই অভাব পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও পরিভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিকে একত্রিত করে তিনি 'শব্দকথা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। "শব্দকথা"র "ধ্বনি-বিচার" অধ্যায়টিতে রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে। সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্পর্কে যে আলোচনা করেন, সেই আলোচনাটি রামেন্দ্রসুন্দরকে "ধ্বনি-বিচার" প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। রামেন্দ্রসুন্দর শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনির মতো বিষয়কেও সরস করে তুলেছেন। বাঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুচ্ছ তিনি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে সাজিয়েছেন। তিনি "মুখবন্ধে" বলেছেন ঃ ".....প্রত্যেক ধ্বনির একটি নৈসর্গিক তৎপরতা আছে—এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত।" রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে রামেন্দ্রসুন্দর ধ্বনির একটি বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ধ্বনির তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করে তিনি এমনভাবে আলোচনা করেছেন যাতে বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ মানুষও সহজেই বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। বাংলা ব্যাকরণ ও পরিভাষা সম্পর্কিত আলোচনাতেও তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধ পড়ে গুণগ্রাহী

১৩. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ সাহিত্য-সাধত চরিতমালা (৭০) পৃ ৫৮

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

'ধ্বনি-বিচার পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম, আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম।'[১৪]

"শব্দ-কথা" গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা নূতনভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। সাহিত্যের এই বৈজ্ঞানিক ও নিতান্ত টেক্‌নিক্যাল দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এই জাতীয় বিষয়কে রামেন্দ্রসুন্দর শুধু সহজ করেই তোলেন নি, একে সুখপাঠ্যও করে তুলেছেন। এইখানেই সব চেয়ে বড় বিস্ময়। পণ্ডিতেরা এই জাতীয় ধ্বনির তেমন মূল্য দেন নি, কিন্তু কবিরা তাঁদের কাব্যে এই সমস্ত উপকরণ সাদরে গ্রহণ করেছেন। "শব্দ-কথা" গ্রন্থের "ধ্বনিবিচার" প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর একটি সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছেন। শব্দতত্ত্ব, পরিভাষা ও ব্যাকরণের এক-একটি দুরূহ বিষয়কে তিনি যেন গল্প করে বলেছেন—বলার ভঙ্গি যেমন সহজ, তেমনি অবলীলাকৃত।

৬

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর যে চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 'নানা কথা' বাদ দিলে আর তিনখানি গ্রন্থেই রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বশেষ চিন্তার পরিণততম রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'যজ্ঞ-কথা' (১৯২০) ও 'জগৎ-কথা' (১৯২৬)—রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাজগতের একটি সামগ্রিক ও সুপরিণত প্রকাশ। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনটি সূত্র অবলম্বন করেই তাঁর চিন্তাপ্রণালী বহুশাখায়িত বিস্তার লাভ করেছিল। এই তিনটি সূত্র হল ঃ বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদবিদ্যা। জীবনের প্রথমলগ্নে 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা' ও 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের মধ্য দিয়া যথাক্রমে এই তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে। 'জগৎ-কথা' গ্রন্থটির কিয়দংশ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর চার বছর পর জগদানন্দ রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'জগৎ-কথা' বৈজ্ঞানেক গ্রন্থ; প্রধানত পদার্থবিদ্যাই এখানে আলোচিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্কলন। কিন্তু 'প্রকৃতি' ও 'জগৎ-কথা'র মধ্যে পার্থক্য আছে। 'প্রকৃতি'-তে তিনি বিজ্ঞানের নানাশাখা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু 'জগৎ-কথায় তিনি মূলত পদার্থ-বিদ্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া, পরবর্তী গ্রন্থটির আলোচনা পদ্ধতিও গভীরতর। প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম দিকের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু পঁচিশ বছর পরে বিজ্ঞানকে দেখেছেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে—সেখানে দর্শনের স্থান অনেকখানি।

'জগৎ-কথা'-র প্রথমেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন ঃ 'জগৎ-কথা অর্থাৎ জড় জগতের কথা।' কিন্তু 'জড়জগৎ' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দর্শনের আশ্রয় নিয়েছেন। 'জগৎ-কথা'

১৪. রামেন্দ্রসুন্দর ঃ আশুতোষ বাজপেয়ী, পৃ ২০৬

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরই সঙ্কলন, কিন্তু দর্শনের পাকা ভিত্তির উপর বিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশের মধ্যেই দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

'জড় শব্দটি আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীন শাস্ত্রে যাহা চেতন নহে, তাহাকেই জড় বলিত। জগতে এমন একজন কেহ আছেন, তিনিই 'আমি'; আর যাহা কিছু আছে, তিনিই অর্থাৎ সেই 'আমি'ই তাহার জ্ঞাতা। আমি জ্ঞাতা আর সমস্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। চন্দ্র, সূর্য, ইট, কাঠ আমার জ্ঞানের বিষয়; আমার দেহ ও চক্ষু-কর্ণাদি অবয়বও আমার জ্ঞানের বিষয়; এমন কি, আবার অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, যাহার সাহায্যে আমি চন্দ্র-সূর্যের ও ইট-কাঠের তত্ত্ব আহরণ করিয়া থাকি, এবং আমার যে বুদ্ধি, যদ্দ্বারা মন কর্তৃক সমাহৃত সেই তত্ত্বকে পরিপাক করিয়া আমি কাজে লাগাই, সেই মন ও বুদ্ধি পর্যন্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রমতে কেবল আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ। অতএব চন্দ্র-সূর্য, ইট-কাট হইতে আমার মন ও বুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই জড় পদার্থ।'[১৫]

'জগৎ-কথা'য় দার্শনিক দৃষ্টির প্রভাব যতই থাকুক না কেন, স্বরূপত গ্রন্থটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্কলন। কিন্তু 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থটি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত সমন্বয় ঘটেছে। ১৩২৩-২৪ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেনের তত্ত্বাবধানে প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক ও বাঙ্ময় জগতের কথা আলোচনা করে তিনি প্রাণময় জগতে এসে প্রবেশ করেছেন। গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি প্রাণকে স্বীকার করে প্রাণের স্বরূপধর্মকে নির্ণয় করেছেন। প্রাণের বৈচিত্র্য, অজস্রতা ও দ্বন্দ্বাভিনয়ের একটি জীবন্ত ছবি তিনি এঁকেছেন। খুব সংক্ষেপে তিনি প্রাণলীলার যে বর্ণনা করেছেন, তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি উজ্জ্বল ঃ

'প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে বাড়াইতেছে, আর অজস্রভাবে অপচয় করিতেছে।...ইহাকে খেলামাত্র বলিতে পারি। আর কোন নাম দেওয়া চলে না। এই খেলিবার জন্য প্রাণী জ্ঞানার্জন করিয়াছে। কিরূপে করিল, জানি না। জ্ঞান প্রাণের ঊর্ধ্ব প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। জ্ঞানবান প্রাণীর সম্মুখেই বাহ্যজগৎ প্রসারিত,—জ্ঞানহীন প্রাণীর নিকটে কোনরূপ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব নাই, বাহ্যজগতের কোন অর্থই নাই। এই জ্ঞান—রূপাদি পঞ্চকের জ্ঞান এবং তাহারও উপরে বিরোধের জ্ঞানই বেদনার জ্ঞান। রূপাদি পঞ্চক নাহিলেও জ্ঞানবান প্রাণীর প্রাণযাত্রা চলিতে পারে, কিন্তু এই বেদনা-জ্ঞান না থাকিলে চলিতে পারে না।' [১৬]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করে তিনি বৈদিক সাহিত্যভূমিতে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করেন। কিন্তু শুধু অনুবাদ ও অনুসন্ধান করেই তিনি পরিতৃপ্ত হন নি, বৈদিক সাহিত্যের নিগূঢ় অন্তরতরে প্রবেশ করে তার স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষায় বেদবিদ্যার রহস্যকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নির্দেশক্রমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধগুলি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, বেদাদত প্রভৃতি অতিক্রম করে তিনি বেদের কর্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডে এসে পৌঁছেছিলেন। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে বিস্ততর আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল, তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যকে এই অমূল্য রত্ন থেকে বঞ্চিত করেছে।

১৫. জড় জগৎ ঃ জগৎ-কথা
১৬. চঞ্চল জগৎ ঃ বিচিত্র জগৎ

যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন ও প্রীতি সাধনের দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন। দ্বিতীয় স্তরে, কোনো কিছু অর্পণ করে দেবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা। এই স্তরে দেবতাকে সামান্য জিনিস দিলেও কোনো ক্ষতি নেই। তৃতীয় স্তরে স্বার্থত্যাগই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ত্যাগই যজ্ঞ। 'যজ্ঞ-কথায়' যে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কর্মকথা' গ্রন্থে তারই সূচনা লক্ষ্য করা যায়। 'যজ্ঞ-কথা' গ্রন্থের বাংলাভাষায় কোনো দোসর নেই। বেদপন্থী ভারতবর্ষের এক অন্তরঙ্গ ও মহিমা-সুগম্ভীর মূর্তিই এখানে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পাণ্ডিত্য ও রসিকতার পার্বতী-পরমেশ্বর একাত্মতা এখানে এক বিস্ময়কর ধ্রুপদী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 'যজ্ঞ-কথা'র উপসংহারে রামেন্দ্র-সুন্দরের ভাবদৃষ্টি বৈদিক ভারতের এক জ্যোতির্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করেছে। বেদপন্থী ভারতভূমির গৌরবগাথা শেষবারের মতো যেন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

'ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহু সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবনযাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্ধ পৃথিবী প্রভাদ্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভাদ্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন; মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।...চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্যা, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন; কেবল স্থূলদেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশবিদেশে বিতরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণার ধারায় দেশ-বিদেশকে ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন।'

রামেন্দ্রসুন্দরের এই গভীর হৃদয়াবেগমণ্ডিত উক্তির মধ্য দিয়া শুধু প্রাচীন ভারতের একটি ভাবরূপই উদ্ঘাটিত হয় নি; ইড়া-সরস্বতী-গায়ত্রী-স্বাহা-সাবিত্রী-অদিতি-সতীরূপিণী মহামাতৃমূর্তিরও বন্দনামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। এই মাতৃমূর্তি পরিণত হয়েছেন দেশজননী-রূপে—এই মূর্তিই 'দশপ্রহরণধারিণী' ও 'কমলদলবিহারিণী।' বলাবাহুল্য বৈদিক ভারতের যজ্ঞকথার মধ্যদিয়া তিনি দেশের মাটিকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। মাতৃবৎসল সন্তানের এ এক অভিনব কাব্যমন্ত্রপাঠ। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ ও দার্শনিকের ভাবগভীরতা অতিক্রম করে রামেন্দ্র-সুন্দর শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর মূলীভূত সত্তাকেই হৃদয়াবেগমণ্ডিত প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর এখানে কবি।

৭

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরচনা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যের একজন কীর্তিমান প্রবন্ধকারই নন, তাঁর গদ্যরচনাগুলি বাদ দিলে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অনেকখানিই বাদ পড়ে। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশিষ্ট। বাংলা-সাহিত্যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ খুব বেশী নেই। দার্শনিক প্রবন্ধের দিকে রচনাপ্রাচুর্যে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই রামেন্দ্রসুন্দরকে অতিক্রম করেছেন। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় আর কেউ সম্ভবত রচনাপ্রাচুর্যের দিক থেকেও তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

সাহিত্যের যে দিকে বেশী লোকের যাতায়াত নেই, জনপ্রিয়তার পথ যেখানে রুদ্ধপ্রায়, রামেন্দ্র-সুন্দর তাঁর তরুণ প্রতিভাকে একদা সেই জনবিরল ও খ্যাতিবিরল পথেই পরিচালিত করেছিলেন। এইখানেই সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি। দুরূহ বিষয়কে নিয়ে তিনি দুরূহতম সাধনা করেছেন। তবু সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সারস্বত সত্তা শুধু বিষয়গৌরবের উপরেই নির্ভরশীল নয়। তার পঞ্চাশত্তম জন্মবার্ষিকীতে সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অভিনন্দনপত্রে লিখেছিলেন ঃ 'তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।'

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যটি সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিচার। স্বল্পায়ু রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, কিন্তু সেই জ্ঞানকে তিনি অলঙ্কারে পরিণত করতে পেরেছেন। দুরূহ বিষয়কে সহজ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তাই বিষয় যত গুরুই হোক না কেন, তিনি অনায়াসে রসসম্পদে পরিণত করেছেন। অধ্যয়ন ও চিন্তালব্ধ সামগ্রী তাঁর চিত্ততলে যে রস সঞ্চার করেছিল, তাই তিনি তাঁর সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ গদ্যরীতির দ্বারা রূপ দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার এই বৈশিষ্ট্য তখনকার কালেও কোনো সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

'পুস্তকখানি ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের লেখা, কিন্তু লেখক তাঁহার পাণ্ডিত্য এরূপ সরলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উহা পাঠকালে পাঠককে কোনোরূপ বেগ পাইতে হয় না।...পাঠক এই পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে নানা নূতন কথা শিখিবেন, অথচ সে সকল তত্ত্বের সমাবেশ এমন অবলীলাক্রমে হইয়াছে যে পাঠক কখনই গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যছটায় অভিভূত হইয়া পড়িবেন না।...রামেন্দ্রবাবুর পুস্তকখানিতে চিন্তাশীলতার বহুদিনের খোরাক সংগৃহীত আছে, উহাতে জ্ঞানকে উন্মেষিত, পুষ্ট ও সম্পূর্ণ সতর্কভাবে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিবার উপযুক্ত বহুবিধ সম্ভার প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা দার্শনিকের মত সহজ কিন্তু কবির মত রসাল এবং সমগ্র পুস্তকখানিতে সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষামোদী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলায় দার্শনিক গ্রন্থ খুব অল্প, এই পুস্তকখানির দ্বারা আমাদের ভাষার গৌরব বিশেষভাবে সংবর্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।'[১৭]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মহাশক্তি' নামক প্রবন্ধটিই রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা।[১৮] উক্ত পত্রিকায় তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সেই প্রথম বয়সের রচনা সম্পর্কে একাধিকবার যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর গদ্যরীতির অন্তঃপ্রকৃতি বিচারে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

'...আর একটু বয়স হইলে পুরাণ বঙ্গদর্শনের, পুরাতন বান্ধবের পাতা উল্টাইয়া পুরাতন কবিতা, পুরাতন প্রবন্ধ পড়িতাম; পড়িয়া আনন্দ পাইতাম। ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকে যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাইত না, তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইতাম। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভীর্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত।'[১৯] অধ্যাপক বিপিন-বিহারী গুপ্ত বলেছেন ঃ

১৭. বাংলা সাহিত্যের মাসিক বিবরণী ঃ ভারতী, আশ্বিন ১৩১১
১৮. নবজীবন ঃ পৌষ ১২৯১
১৯. অল্প-মধুর ঃ ভারতীয়, বৈশাখ ১৩২৩

'কলেজে পড়িবার সময় তিনি বাংলায় প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন,—"প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল; তাঁর মত গমগমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সময় লেগেছিল। ক্রমশ দেখলাম যে আমি যে সব কথা বলতে চাই, তা ও ভাষায় চলবে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হল।

এই দুটি স্বীকৃতি থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা উচ্ছ্বাস-ফেনিল, আবেগবহুল ও বর্ণময়। কিন্তু এ ভাষায় বক্তব্য আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে এ ভাষা নিজের প্রসাধনরচনায় তৎপর। অতিকথনের প্রগল্‌ভতা, বিশেষণবাহুল্য ও ফেনস্ফীত ভাবোচ্ছ্বাস কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির কয়েকটি বিশিষ্ট দুর্লক্ষণ। কিন্তু উচ্ছ্বাসপ্রবণ অপরিণতবুদ্ধি তরুণ মনের উপর এ ভাষা যে কিছুকাল প্রভাব বিস্তার করবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কালীপ্রসন্নের কাব্যোচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্যরীতি তাই তরুণ রামেন্দ্রসুন্দরেও মুগ্ধ করেছিল। 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র তাঁকে এই 'মোহপাশ' থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের এই স্নেহানুকূল্য ছাড়াও এই মোহবন্ধন ছিন্ন করার প্রকৃত শক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল যুক্তিবাদের দীক্ষা। স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা, যুক্তিগ্রাহ্যতা, বিশ্লেষণের নিপুণতা তাঁর সুকর্ষিত মনের ভিত্তিমূল রচনা করেছিল। তাই অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যেই কালীপ্রসন্নের মেদবহুল অতিচিহ্নিত ভাষার মোহপাশবন্ধন ছিন্ন করতে পেরেছিলেন। কারণ সে ভাষা ছিল তাঁর মনোধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তাঁর বক্তব্যের উপযুক্ত ভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বেশীদিন তাঁকে অনুসন্ধান করতে হয় নি—অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষার সন্ধান পেয়েছিলেন।

প্রথমদিকের সামান্য ক'টি রচনা ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে কোথায়ও অপরিণতির চিহ্ন নেই। কারণ তিনি তাঁর মনকে অতান্ত দ্রুত রচনা করেছিলেন। অনেকের জীবনেই দেখা যায় যে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাঁরা নিজেদের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মনের গঠনই ছিল অন্যরকম, মনের দিক থেকে তিনি খুব দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গদ্যরীতির মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্য-জীবনের হাতেখড়ি বঙ্কিমপর্বেই। তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলি সংশোধন করেছেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির সঙ্গে বঙ্কিমপর্বের খ্যাতনামা গদ্যশিল্পীদের পার্থক্য কম নয়। এই গদ্যরচয়িতাদের রচনাদর্শ তাঁর সামনে থাকলেও তিনি যে সেখানেই নিবদ্ধ থাকেন নি, তার প্রমাণও আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্ববর্তী বাংলাভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করা হয়েছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর পূর্বসূরীদের চেয়েও অনেক সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর গদ্যের সাবলীলভঙ্গি, সহজ মসৃণতা ও সৌকুমার্য যে এই অভিনব প্রকাশরীতির অনেকখানি, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

৮

রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যার বিচিত্র শাখা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথায়ও উগ্র পাণ্ডিত্য

২০. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ ৭৮

তাঁর রসিকতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা প্রাচীনসভ্যতা সম্পর্কিত গবেষণা, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান—সমস্ত কিছুই সাহিত্যগুণসমন্বিত হয়ে উঠেছে। এর জন্য দায়ী তাঁর অপূর্ব ভারসাম্যময় সুকর্ষিত গদ্যরীতি। 'বিচিত্রজগৎ' গ্রন্থের প্রথমেই তিনি একদা যে 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি'র কথা উল্লেখ করেছিলেন, তার সুমহান দীপ্তিতেই তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যগুণ-সমন্বিত হয়ে উঠেছে। তার গদ্যরীতির মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাঁর পাণ্ডিত্যকে অতিক্রম করে অভিনব শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে।

বিজ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর আলোচনাকে যতদূর সম্ভব সহজ করেছেন। অতি সাধারণ ঘরোয়া উপমা, হাস্যরস প্রভৃতি তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিকে সরস করে তুলেছে। কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি ও সহজ কথোপকথনের রীতি বিষয়ের দুরূহতাকে সরস করে তুলেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের মধ্যে এই জাতীয় বাক্যের অজস্র উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় ঃ

(ক) 'আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, অতএব অন্যালোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূমণ্ডলটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বনের পরিবর্তে আইরিশ হোমরুল লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।' [প্রলয় ঃ প্রকৃতি]

(খ) 'প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে—লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে—লোকটা পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।'

[নিয়মের রাজত্ব ঃ জিজ্ঞাসা]

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে সুখপাঠ্য করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কখনো প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে পরিচিত উপমা সন্নিবেশ করেছেন, কখনো হাস্যপরিহাসের জ্যোতিতে বক্তব্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। দুরূহ বিষয়কে সহজভাবে পরিবেশন করার জন্য তিনি বস্তুর প্রতিটি অংশকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অনেক সময় তিনি যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা মনেই হয় না।—একটির পর একটি তিনি জটিলতার জাল মুক্ত করেছেন। কিন্তু এমন সহজে জটিল গ্রন্থী মোচন করেছেন যে, মনে হয় না সেখানে কোনো প্রয়াস আছে। মনে হয় যেন তিনি কোনো তরুণ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি পড়লেই তার নমুনা পাওয়া যায়।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৌতুকহাস্য মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাকে রমণীয় করে তুলেছে। কিন্তু সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে তিনি মাঝে মাঝে শ্লেষাত্মক মন্তব্যও করেছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য তাঁর প্রসন্ন চিত্তের অনুকূল না হলেও যে কয়েকটি জায়গায় তিনি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন, তার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কঠিন দীপ্তি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি উদাহরণ দিলেই বক্তব্য পরিস্ফুট হবে ঃ

'ষাটি বৎসর পূর্বে এ দেশে সাবাস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাবাস্ত হইবামাত্র বিলাতী সরস্বতী দশমাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ব সন্তান প্রসব করিলেন; এবং একস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে

উন্নীতা হইবেন; কেহ আশংকা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়ীকে ভারতসাগরে ডুবাইয়া মারিল।'

[ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম ঃ নানাকথা]

ইংরেজি শিক্ষার আতিশয্য দোষ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর যে অম্লমধুর শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন, তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। 'শ্বশ্রুগুম্ফধারী সুপক সন্তান' বাক্যাংশটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। একটি সুপ্রযুক্ত উপমা যে কিরূপে একটি বক্তব্যকে সহাস্য-সুন্দর করে তোলে তার উদাহরণও বিরল নয় ঃ (ক) 'বস্তুতঃ ত্রিশকোটি মনুষ্যের সমবায়ে গঠিত একটি সমগ্র জাতি ইউলিসিসের দৃষ্ট লোটাস্‌ইটারগণের মত নেশার ঘোরে ঝিম ধরিয়া বসিয়া আছে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা প্রকাণ্ড ফক্কিকা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যদ্ভবিষ্য সাজিয়া বসিয়া আছে, এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর অন্যত্র বিরল।'

[সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ঃ নানাকথা]

(খ) 'আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্‌গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন, এবং তঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হর ডাল বিগলিত হইয়া অংগপ্রত্যংগে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম যে বাংলা সাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্‌গজের মত শতদল কমল যখন বিদ্যমান আছে, তখন গঞ্জাম চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমল চয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।'

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ চরিত-কথা]

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে যে শুধু দুরূহ বিষয়বস্তুর সহাস্যসুন্দর মধুর মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই নয়, ভাষার বলিষ্ঠতা ও ক্লাসিকাল সংহতিগুণে এই রীতি এক এক সময় মহিমা-সুগম্ভীর হয়ে উঠেছে। ভূতত্ত্ববিদ লায়ালকে অনুসরণ করে তিনি হিমালয়োৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন, তা যেমন জীবন্ত, তেমনি কল্পনাসমৃদ্ধ ঃ

'পূর্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণ-কলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুষারমণ্ডিত সূর্যকিরণোজ্জ্বল শৃংগসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোররবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। শৃংগের উপর শৃংগ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল; অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব নর্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।'

[মহাকাব্যের লক্ষণ ঃ নানাকথা]

বিশালকায় হিমাচলের উৎপত্তি বিবরণটিকে রামেন্দ্রসুন্দর শব্দপেশল ভাষায় জীবন্ত করে তুলেছেন। এই ভাষার সংগে যুক্ত হয়েছে কল্পনাশক্তি। তাই অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলেছেন। দ্বৈপায়নহ্রদের তীরে ভগ্নউরু দুর্যোধনের আসন্ন মৃত্যুর কালোছায়ার সংগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সমন্বিত হয়ে যে ধ্বংস-করাল পটভূমিকার সৃষ্টি করেছিল, রামেন্দ্রসুন্দর চিত্রধর্মী ভাষায় ও কল্পনার ঐশ্বর্যে তাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন ঃ

'যখন দর্পের অবতার কুরুকুলপতি দুর্যোধন পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বান্ধবহীন, অনুচরহীন হইয়া বিকলাংগ অবস্থায় দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমির একপ্রান্তে ধূলিলুণ্ঠিত হইতেছিল, যখন মাংসাশী শৃগালকুক্কুর মাংসলোভে হর্ষের সহিত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল ও তখনও তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পরাবৃত্ত হইতেছিল, যখন নরমাংসভোজনে পূর্ণোদর গৃধ্রকুল উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উপবিষ্ট হইয়া একাদশ অক্ষৌহিনীর অধিনেতার প্রতি লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেইদিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষুব্ধ মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছে, যখন সেই মহাসাগরের পৃষ্ঠের উপর নিবিড় অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর অষ্টাদশ-দিনব্যাপী উন্মত্ত রণকোলাহল মৃত্যুর নিস্তব্ধ নীরবতায়

শ্রান্তিলাভ করিয়াছে, সেই সময়ে পাণ্ডবশিবিরে করালা মহাকালীর ভীমমূর্তি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মহানিশার অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া দিল, সুপ্ত মানবের মরণকোলাহল নিশীথিনীর নীরবতা বিদীর্ণ করিল, আর সেই নিবিড় অন্ধকারকে দীপ্ত করিয়া অশ্বত্থামার মুক্ত কৃপাণ পরিশ্রান্ত সুখসুপ্ত অসহায় পাণ্ডব-সৈনিকগণের, পাণ্ডব-বান্ধবগণের ও পাণ্ডবপুত্রগণের কণ্ঠ হইতে রক্তস্রোত ঢালিতে লাগিল।'

[ধর্মের জয় ঃ কর্ম-কথা]

উদ্ধৃত অংশটি থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির চূড়ান্ত সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ সাবলীল প্রবাহ মহিমান্বিত কল্পনার আলোকে বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। ভাস্কর্য-সুঠাম শব্দ-বিন্যাস ও মর্মর-মসৃণ বাক্যাংশগুলি এই গদ্যরীতির ঐশ্বর্যকে বর্ধিত করেছে। অতীত ও অপ্রত্যক্ষকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তুলতে হলে যে জাতীয় বর্ণনাশক্তির প্রয়োজন, এখানে তা মোটেই অনুপস্থিত নয়। হৃদয়াবেগ এখানে গতির সঞ্চার করেছে, কিন্তু এই আবেগ আতিশয্যে পরিণত হয় নি। কালীপ্রসন্ন যেখানে হৃদয়াবেগের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, বলেন্দ্রনাথ যেখানে চিত্রাতিশয্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে ভারসাম্য নষ্ট করেছেন, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর সেখানে তাঁর পরিমাণবোধ ও ভারসাম্য কোথায়ও হারান নি। 'জিজ্ঞাসা'র 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' প্রবন্ধটির স্টাইল এক অদ্ভুত ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত।

সমকালীন দুজন গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির সংগে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির তুলনা করলে শেষোক্ত লেখকের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে তাঁর কবিহৃদয়ের আবেগস্পন্দন জড়িত আছে। তার চিত্রধর্মী ও বর্ণাঢ্য গদ্যরীতির মনোহারিত্বের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, এই রীতি ঠিক সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল নয়। প্রাচীন কাব্যকলা ও চিত্র-ভাস্কর্য আলোচনারই উপযুক্ত এই ভাষা। বলেন্দ্রনাথের 'কোনারক' যেমন এক অতীতযুগের নির্জন পরিত্যক্ত পাষাণস্মৃতি, তেমনি তাঁর ভাষাও যেন স্মৃতিমন্দিরে সংরক্ষিত অতীতযুগের এক মহিমান্বিত শিল্পকীর্তি। যেন বর্তমান কালের সংগে এর কোনো যোগ নেই। বর্ণ ও বর্ণনার আতিশয্য এখানে আছে। এ ভাষা প্রাত্যহিকের বাহন নয়, অসাধারণ স্মৃতিচিন্ময় অনুভূতিই এর আরোহী।

প্রমথ চৌধুরী বাংলাগদ্যের অসাধারণ স্টাইলিস্ট হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর গদ্যস্টাইলেও আতিশয্যদোষের অভাব নেই। তিনিও তাঁর কতকগুলি ম্যানারিজম্ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ভাষাকে তির্যকগতি করার জন্য অনেক সময় তা জটিল ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির সবচেয়ে বড়গুণ এর ভারসাম্যতা। কোথায়ও তেমন চমকসৃষ্টির চেষ্টা নেই, বক্তব্যকে অতিক্রম করে কোথায়ও ভাষা বা ভঙ্গি অকারণ-প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে নি। সর্বপ্রকার কৃত্রিমতাকে বর্জন করে ভাষা যেমন সহজ, তেমনি পরিচ্ছন্ন; কিন্তু গাম্ভীর্যে ও আভিজাত্যে বিশিষ্ট। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতি ভারী হয়েও অচল নয়। সাধুভাষার বহিরাবরণের অন্তরালে আছে চলতি গদ্যের সচল মেজাজ। রামেন্দ্রসুন্দরের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু চলতি ভাষায় লেখা তাঁর এই একমাত্র রচনা থেকেই তাঁর এই ভাষায় লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ কথকতা ও রূপকথার ভঙ্গিকে তিনি এখানে আয়ত্ত করেছেন।

বাংলা গদ্যশিল্পীদের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রবন্ধসাহিত্যের স্বর্ণযুগে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গদ্যরীতি পূর্ববর্তী কোনো লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে হতে

পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির পার্থক্য অনেকখানি। বঙ্কিমী রীতিকে রামেন্দ্রসুন্দর আরো সহজ ও সুন্দর করেছিলেন। প্রবন্ধকার হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর পূর্ণতর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে গদ্যরীতির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু তার সব কটি স্তরই সমান নয়। বক্তব্যকে গৌণ করে রবীন্দ্রনাথের সম্ভ্রান্ত-ভাষা অনেক সময় তার নিজস্ব কলাকৌশল দেখিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষার যত রমণীয়তাই থাক না, তা বক্তব্যকে অতিক্রম করে কখনো নিজস্ব মহিমা দেখায় নি। বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ, স্বচ্ছন্দগতি, প্রসাদগুণ ও অপূর্ব ভারসাম্য রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিকে শিল্পকর্মে মণ্ডিত করেছে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের সহজ-সুন্দর শুভ্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রসন্নজ্যোতি তাঁর এই গদ্যরীতিকে অসামান্য ও অননুকরণীয় করে তুলেছে। তাঁর প্রসন্ন-মধুর সহাস্য-সুন্দর ব্যক্তিত্বেরই শিল্পরূপ তাঁর বিচিত্রবিষয়াশ্রিত প্রবন্ধাবলী।

ছিন্নপত্র

সোমেন বসু

পত্র-সাহিত্য বাংলা দেশে কিছু এমন পুরানো জিনিষ নয়। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে অল্পকাল তাহার আগে চিঠিপত্র লেখা নিশ্চয় হত কিন্তু চিঠিপত্র যে সাহিত্য হয় নাই রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত —একথা সকলেই জানেন।

পত্র-সাহিত্য আদৌ সাহিত্য কিনা বা কি-কি গুণাবলীর জন্য সাহিত্য সে-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে। সাধারণত সাহিত্য রচনায় কবি এবং কাব্য যত বড় পাঠকগোষ্ঠীও ততটাই বড় এবং প্রয়োজনীয়। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন তাহার চোখের সামনে যে বিরাট পাঠকগোষ্ঠী আছে তাহার কথা স্মরণ রাখিয়া। এই পাঠকগোষ্ঠীর মন যে-সমস্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত সেইগুলিকে তিনি হয় সমর্থন করেন নয় আঘাত করেন। কিংবা নিছক আনন্দদানের জন্য এমন-কিছু সৃষ্টি করেন, যাহার সঙ্গে পাঠকগোষ্ঠীর মতামত, ধারণা প্রভৃতি কোন কিছুরই সম্পর্ক নাই। তবুও একথা ঠিক যে, পাঠক সমাজের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি। পত্রসাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য ধরণের সাহিত্যের মূলগত পার্থক্য এইখানেই। লেখক যখন তাঁহার নিজের মনের কথাগুলি বা অভিজ্ঞতাগুলি একটি বিশেষ কোন হৃদয়কে উপলক্ষ করিয়া বলেন তখন স্বভাবতই নানা দিক হইতে তাঁহার স্বাধীনতা অনেক বাড়িয়া যায়। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা আর যিনি লিখিতেছেন তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপরে লেখকের চিন্তা, অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী ও স্বাধীনতা নির্ভর করে। পত্রসাহিত্যে উদ্দিষ্ট একটি ব্যক্তি অন্যান্য সাহিত্যে উদ্দিষ্ট সমস্ত পাঠকগোষ্ঠী সুতরাং উদ্দেশ্যভেদে এই উভয় শ্রেণীর সাহিত্যে যে কিছু চরিত্রগত পার্থক্য থাকিবে আশা করি তাহা সকলে স্বীকার করিবেন।

পত্রসাহিত্যের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। লেখকের আত্ম-উদ্‌ঘাটনের যথেচ্ছ স্বাধীনতা সত্ত্বেও উদ্দিষ্ট পাঠকের গ্রহণশক্তি এবং বোধশক্তি লেখকের বন্ধহীন প্রকাশ ভঙ্গীকে সীমায়িত করে। যাহাকে লেখা হইতেছে, তাহার মানসিক স্তর, লেখকের রচনার স্তর নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। সুতরাং পাঠকগোষ্ঠীর ভয় না থাকিলেও একটি স্বেচ্ছারোপিত বন্ধন লেখককে মানিয়া লইতেই হয়। সৌভাগ্য আমাদের এই যে, ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি যাঁহাকে লেখা হইয়াছিল তিনি বয়সে ছোট হইলেও তাঁহার মানসিক পরিণতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছিল। তাই ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনেক সহজে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

যে-অবস্থার মধ্যে লেখক চিঠি লেখেন, সেই অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি যে কবির রচনায় কিছু রঙ্ লাগাইবে এ-বিষয়ে সন্দেহ কিছু নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের চিঠিগুলির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি যে, যখনই যে-প্রকৃতির অঞ্চলছায়ায় তিনি আশ্রয় লইয়াছেন সেই প্রকৃতিই তাঁহার লেখার সুর বাঁধিয়া দিয়াছে। 'জাভাযাত্রীর পত্র' বা রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতির মধ্যেও আমরা দেখি সেই সমস্ত দেশ তাহার শিল্পকলা ও মানুষগুলি নানাভাবে তাঁহার পত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করিয়া লইয়াছে। ইহা না হওয়াই অস্বাভাবিক তাহাতে প্রমাণ হয় জগতের বহির্শক্তিগুলির প্রতি লেখক একান্তই উদাসীন। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে' আমরা দেখিয়াছি যে পদ্মা নদী তাঁহার সমস্ত রচনার ভিতর দিয়া ওতঃপ্রোতভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। নদীর জলধারা এবং তাহার দুই প্রান্তের অঞ্চলগুলি ছিন্নপত্রের মধ্যে নানা রঙে বিকশিত হইয়াছে। নগরবাসী রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কৃত্রিম যান্ত্রিক জীবনের বাহিরে অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রকৃতির কোলে নিজেকে

সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁহার এই প্রথম।

পত্র-সাহিত্য বিচারে কয়েকটি কথা আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন। প্রথম কথা হইল এই যে, পত্র-সাহিত্য মূলতঃ পত্র হওয়া চাই। পত্রধর্মনিরপেক্ষ কোন রচনা যত ভালই হউক, তাহা পত্র-সাহিত্য হইতে পারে না। ভাল পত্রের মধ্যে দুইটি সজীব মানব হৃদয়ের অস্তিত্ব অনুভব করিবার সুযোগ থাকা চাই। নিছক এক পক্ষের স্বগতোক্তি উচ্ছ্বসিত গীতি-কবিতার ভাল নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে পত্রের গুণ কোথায়? সুতরাং পত্র লেখক ও উদ্দিষ্ট পাঠকের একটি নিবিড় যোগসূত্র পত্রের মধ্যে থাকা চাই। দ্বিতীয় কথা, দুইপক্ষ উপস্থিত আছে অথচ দুইপক্ষের কোন কথা-ই নাই, নিছক একটি প্রকৃতি বর্ণনা হইল, বা একটি চলতি-ঘটনার ব্যাখ্যা হইল, তাহাতেও পত্র-সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। লেখকের মন যদি কথা না বলে, একটি বর্ণনাত্মক বিবরণ দেওয়া ছাড়া তাঁহার যদি আর কিছুই বলিবার না থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে পত্র-সাহিত্য হিসাবে উচ্চস্তরের বলিয়া গণ্য করা কঠিন। ছিন্নপত্রের অনেক চিঠি, এই বিচারে অপূর্ব সাহিত্য, কিন্তু আদৌ পত্র-সাহিত্য নয়। সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সুন্দরতম গীতি কাব্যের রচনা হইতে পারিত, কিন্তু কোন কোন স্থানে অনুভূতির আত্যন্তিক নৈর্ব্যক্তিতা চিঠিগুলিকে ভাল হইতে দেয় নাই। তৃতীয়তঃ যে পারিপার্শ্বিক এবং প্রকৃতির বর্ণনা পত্রের মধ্যে আছে, তাহার প্রতি লেখকের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি সে-টুকুও যদি সঙ্গে না থাকে তাহা হইলে একদেশদর্শী হইয়া পড়ে। সেখানে বর্ণনীয় বস্তুর বর্ণনার লোভই প্রবল হইয়া উঠে। এই অপরাধও ছিন্নপত্রের লেখক একেবারে এড়াইতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের মূল ধারাটিকে বুঝিবার পক্ষে তাঁহার চিঠিগুলি যে আমাদের অমূল্য সাহায্য দেয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, কাব্যের মধ্য দিয়া যে ভাবের প্রবাহ চলিয়াছে, যে-ভাবকে কাব্যরূপে বাঁধিতে গিয়া কবি যথেষ্ট স্বচ্ছ করিয়া প্রকাশ করেন নাই, তাহারই সরল সহজ ধারা এই পত্রগুলির মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। 'সোনারতরী'র যুগ আর ছিন্নপত্রের যুগ একই। একদিকে কবি তাঁহার বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে কাব্যের সহস্র ধারায় সংগীত উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করিয়াছেন, অন্যদিকে সেই অনুভূতিগুলির সহজ, সরল, একটি প্রকাশ এই চিঠিগুলির মধ্যে রহিয়াছে। অধিকাংশ পাঠকের কাছে মনে হইবে যে, চিঠির মধ্যে তাঁহার যে-প্রকাশ, তাহা যেন অনেক বেশী আন্তরিক। পাঠক সমাজের কাছে কাব্যসৃষ্টির যে কলাকৌশল ও রীতি-নীতি সযত্ন প্রকাশভঙ্গী কবিকে মানিয়া চলিতে হইয়াছে, চিঠি লিখিতে বসিয়া সেই সংযমের অনেকটা শৈথিল্য ঘটিয়াছে। তাই কাব্যে যে অনুভূতিগুলি কিছু অস্পষ্ট, কিছু ব্যঞ্জনাময়, পত্রের মধ্যে সেইগুলিই স্পষ্ট। সুতরাং 'ছিন্নপত্র' কবির 'সোনারতরী'র যুগের অনবদ্য ব্যাখ্যাও বটে। শিলাইদহে পদ্মার তীরে রবীন্দ্রনাথের এই দিনযাপন সমস্ত বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনের কাব্য সাধনার মধ্যে বারবার একথা বুঝিবার সময় দিয়াছেন যে তাঁহার কবিত্বের পূর্ণ বিকাশে পদ্মা অনেকটা দায়ী। এখানে বাস করার আগে তিনি অভিভাবকহীন ভাবে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বাধীন হইয়া আর কখনো অন্য কোথাও বাস করেন নাই। অল্প বয়সে ইংল্যান্ড গিয়াছিলেন, কিছুকাল আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন এবং 'মানসী' রচনার সময় গাজীপুরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতিকে নিগূঢ়ভাবে জানিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তিনি নিজেই 'সোনারতরী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে পদ্মার উপরে এই দিনগুলি কাটানোর সময়েই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার একটা সত্যকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইল।

'ছিন্নপত্রে'র অনেকগুলি চিঠি যে পত্র-সাহিত্য হিসাবে ভাল হয় নাই, একথা বলিলে খুব

অন্যায় বলা হইবে না। কিন্তু নিছক বর্ণনামূলক বাক্যবিলাসী সেই চিঠিগুলি বাদ দিলেও যে-বিরাট অংশ বাকী থাকে, তাহার মূল্যের সীমা নাই। সেই চিঠিগুলির মধ্য হইতে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার একটি ধারণা আমরা করিতে পারি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই চিঠিগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাইতে পারি যে, কয়েকটি প্রধান প্রধানভাব এই সময়ে তাঁহার মনের ভিতরে প্রবাহিত হইতেছিল। (১) ছিন্নপত্রের অনেক সমালোচকই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহার চিঠিগুলির মধ্যে একটি করুণ বিষণ্ণতার সুর লাগিয়া আছে। পূর্ণ যৌবনে সহর হইতে দূরে নির্বাসিত এই নিরুপদ্রব নিস্তরঙ্গ জীবনে কবির মনে কিছু অকারণ বেদনার স্পর্শ লাগিতেই পারে। কিছু গুরুতর দুঃখকর ঘটনা না ঘটিলেও যখন প্রকৃতির সমস্ত সুরের মধ্যে কবি পূরবীর আভাস শুনিতে পান তখন এই কথাই মনে হয় যে কবির মন অত্যন্ত সংবেদনশীল। (২) আর একটি অতি পরিচিত ভাব—এই পৃথিবীর প্রতি কবির সুনিবিড় ভালবাসা। আমরা আমাদের সাংসারিক জীবনের চাপে প্রকৃতির আনন্দদানের বিরাট আয়োজনের প্রতি প্রায়ই অবহেলা দেখাইয়া থাকি। কিন্তু যদি কখনো শান্ত চিত্তে এই পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিব যে, এই সুখে-দুঃখে, হাসিকান্নায় ভরা পৃথিবী অত্যন্ত সুন্দর এবং সে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। (৩) আর কয়েকটি চিঠিতে বলিতেছেন যে সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে প্রাণের যে-ধারা তৃণে-পুষ্পে-পল্লবে পশুপক্ষী এবং মনুষ্যের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তাহার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। আমাদের প্রত্যেকের জীবন একটি অখণ্ড প্রাণকেন্দ্র হইতে প্রবাহিত হইতেছে, এ-কথা কবি 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় বলিয়াছেন। (৪) বড় কীর্তি এবং বিপুল সম্মানের আশায় আমরা জীবনের ছোটখাটো মুহূর্তগুলিকে উপেক্ষা করি, অথচ এই তুচ্ছ মুহূর্তগুলির মধ্যে যে আনন্দ আছে, তাহার পরিমাপ ঐ বড় কীর্তির সঙ্গেও হয় না। আমাদের অজান্তে জীবনের প্রতি আমাদের এই অবহেলা সম্বন্ধে কবি অনেক কথা কয়েকটি চিঠিতে লিখিয়াছেন। একথা মানিতেই হইবে যে সুদীর্ঘকাল পদ্মার তীরে থাকার ফলে তাঁহার দৃষ্টি অনেকটা একাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল। তবু একথা ঠিক যে এই যে-সমস্ত ভাবনাগুলি ছিন্নপত্রের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে ইহারই পরবর্তী জীবনে কবির কাব্যে আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ছিন্নপত্রের বক্তব্য বিষয় আলোচনার আগে আর একটি কথা বোঝা দরকার। আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি ছিলেন। 'সোনার তরী'র কবি যদি রোমান্টিক হয়, তাহা হইলে ছিন্নপত্রের কবিও রোমান্টিক। রোমান্টিক কাহাকে বলে এবং ছিন্নপত্র রোমান্টিক-সাহিত্য কি-না এই প্রশ্নই এখন আমাদের আলোচ্য। রোমান্স্ বস্তুটি কোনও পার্থিব বস্তুর গুণ নয় ইহা আমাদের মনের একটি বিশেষ অবস্থা। কোন নূতনের পরিচয়ে আমরা যখন সুন্দরের সন্ধান পাই এবং যখন তাহার মধ্যে একটি বিস্ময়ের মোহ-স্পর্শ থাকে, তাহাকেই আমরা রোমান্টিক মনোভাব বলিতে পারি। ওয়াল্টার পেটার ইহাকেই বলিয়াছেন—"Strangeness added to beauty" নিছক সুন্দর যাহা তাহা অনেকটা অভ্যাসবশেই আমাদের ভাল লাগে। যেমন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত। অভ্যাস এমন হয় যে, এই প্রাকৃতিক ঘটনা দুইটি অপূর্ব সৌন্দর্যের কেন্দ্র জানিয়াও আমরা তাহাদের প্রতি যথেষ্ট মনযোগ প্রত্যহ দেই না। কারণ তাহার মধ্যে কোন নূতনতর বৈচিত্র্যের স্পর্শ পাই না। কিন্তু হঠাৎ যদি কোন একদিন সূর্যাস্তের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মনের ভিতর একটা অকারণ বেদনা ঘনাইয়া উঠে তখন সেই প্রত্যহকার সৌন্দর্য এক অপূর্ব রসমূর্তিতে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। এই রস-উপলব্ধিই রোমান্টিসিজম্। ছোটবেলার বাস্তব দিনগুলির মধ্যে যাহার খুব আনন্দের কিছু ছিল না, সেও যখন পরে পরিণত বয়সে দূর হইতে এই দিনগুলির

প্রতি স্নেহভরে ফিরিয়া চায় তখন মনের ভিতর একটি আক্ষেপ জাগিয়া উঠে, সেই বিগত দিনগুলি কত মধুর বলিয়া মনে হয়। এই যে মনোভাব, ইহার পিছনেও রোমান্সের ক্রিয়া চলিয়াছে। ছিন্ন-পত্রের পাতায় পাতায় এই রোমান্টিক অনুভূতির প্রবল প্রকাশ। কবি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহারই মধ্যে একটি অসীমের স্পর্শ, একটা অনির্বচনীয়ের আনন্দ তাহার মন স্পর্শ করিয়াছে—যাহার কোন ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। তজ্জন্যই এই আত্ম বাস্তব পৃথিবীকে দেবতার মেয়ে বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহার মুখের উপরে একটি দুঃখের ভাব তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে। সেইজন্যেই কারণে-অকারণে ছোট বেলার দিনগুলিকে বারবার ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়। ঐ রোমান্টিক মনই বীরত্ব এবং কবিত্বে তৃপ্ত না হইয়া জীবনের ছোটখাট সম্পদগুলির মধ্যে আনন্দের আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায়। ছিন্নপত্রের প্রত্যেকটি চিঠি যে নিছক প্রকৃতি বর্ণনায় পর্যবসিত হয় নাই, তাহার কারণ হইতেছে এই রোমান্টিক মনের এমন একটি স্পর্শ যাহা পাঠকচিত্তেও অনুরূপ স্বপ্নের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ছিন্নপত্রের অনেক চিঠির মধ্যে একটি বিষণ্ণ বেদনার সুর সহজেই অনুভব করা যায়। সময়ে সময়ে প্রকৃতির বহু বৈচিত্র্যও কবির কাছে গভীর শূন্যতার ভাব বহন করিয়া আনিয়াছে। বিশেষ করিয়া সূর্যাস্তের মুহূর্তে যখন কর্ম্ম-অবসর দিন শান্ত হইয়া আসে, তখন যেন সমস্ত প্রকৃতির অন্তর মথিত হইয়া বহুদূর ব্যাপী একটি করুণ রাগিণী কবির মনকে দোলা দিতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশের তারাগুলি ম্লান হইয়া উঠে, রাত্রির নিবিড়তা জলধারার উপরে কঠিন বেদনার অবগুণ্ঠনের মত নামিয়া আসে। একথা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে যে, এই বিষণ্ণতা প্রকৃতির মধ্যে নাই, আছে কবির মনের মধ্যে। পূর্ণ যৌবনের সূচনায় কবির এই মন-ভরা বেদনার কি কারণ থাকিতে পারে। শুধু কথার খেলা দেখানোর জন্যে তিনি নিশ্চয়ই এইগুলি লেখেন নাই। একটি সমব্যথী চিত্তের কাছে আত্মপ্রকাশের দারুণ ব্যাকুলতায় ছিন্নপত্রের জন্ম। সুতরাং একথাই মনে করিয়া লইতে হইবে যে, অভিভাবকহীন বহির্জীবন-যাপনে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়ার এই সুযোগ তাহাকে তাঁহার মন লইয়া নানা গবেষণার সুযোগ দিয়াছিল। তিনি যে সাধারণের চেয়ে অনেকবেশী সংবেদনশীল ছিলেন, একথা যদি স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে দ্বিধাতে না বোঝাতে পারিলেও, একথা অনুভব করা যাইতে পারে যে, একটি পূর্ণ বয়স্ক যুবকের মন নির্জন নদীপ্রান্তে কেন অকারণ বেদনার্ত্ত হইয়া উঠে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সন্ধ্যার মেঘের মত তাঁহার মনের রঙ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাইতেছে। ১০ নম্বর চিঠিতে লিখিতেছেন "আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য। নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা, আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা।" কিন্তু কয়েক লাইন পরেই লিখিতেছেন "পৃথিবী যে বাস্তবিক কি আশ্চর্য্য সুন্দরী তা কোলকাতায় থাকিলে ভুলে যেতে হয়।" একথা বলাই বাহুল্য যে, দুঃখ আর আনন্দ পরস্পর বিরোধি না হইলেও শূন্যতা আর কবি-কথিত এই সৌন্দর্য্য এক জিনিষ নয়। ১৪নং চিঠিতে লিখিতেছেন যে, সন্ধ্যা যেন একটি বধূর মত। সে আমাদের মনে এক স্বপ্নলোকের রচনা করে। কিন্তু সেই সমস্ত স্বপ্নটি একটি গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন। কবি সন্ধ্যার এই ভাবটিকে প্রকাশ করিয়াছেন অতি সুন্দর একটি ছবিতে "একটি নির্নিমেষ চোখের বড় বড় পল্লবের নীচে গভীর ছলছলের ভাবের মত।" এই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে পড়িয়াছে যে আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গীতের মধ্যে এমন কয়েকটি রাগিণী আছে, যাহারা পৃথিবীর সমস্ত বিষণ্ণতাকে রূপ দিতে পারিয়াছে। এই মনোভাব যে শুধু প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াতেই আসিয়াছে তাহা নয়। মানব-জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলি, নদীতীর প্রান্তের হাসিকান্না মিশ্রিত যে জীবনের স্রোতকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া চলে, তাহার মধ্যেও কবির মন একটি হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর স্পর্শ পাইয়াছে। ৩০নং চিঠিতে

বলিতেছেন যে, একটি ছোট মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল এবং তাহার ছোট বোনটি ও অন্যান্য মহিলারা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবে কবির মনেও বেদনার স্পর্শ জাগিল। তিনি লিখিতেছেন—"সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ।" এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বেদনার কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ কবি কখনো দেখিতে পান নাই। ৩৫নং চিঠিতে সেই কথাটি আবার লক্ষ্য করি যেখানে এই সুন্দরী পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া কবি মুগ্ধ হইয়া বলেন "কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ব, কী অসীম করুণা পূর্ণ বিষাদ।" ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ এই যে দুঃখের স্পর্শ পাইয়াছেন, ইহা সূক্ষ্মবোধ শক্তি রহিত কোন লোকের পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই দুঃখের সঙ্গে সংসারের কোন লাভক্ষতির যোগাযোগ নাই। প্রথম যৌবনের রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই বিরাট সৌন্দর্য্যকে যে শুধু রূপবিলাসীর দৃষ্টিতে দেখেন নাই, এই চিঠিগুলি তাহারই প্রমাণ।

দ্বিতীয় যে মনোভাবটি চিঠিগুলির মধ্যে আমরা দেখি তাহা হইল পৃথিবীর প্রতি কবির নিবিড় ভালবাসা। অল্প বয়সে গণ্ডীবাঁধা ভৃত্যতন্ত্রের মধ্যে বাস করিয়া বহির্জগতের জন্য একটা গভীর আকর্ষণ কবির মনের মধ্যে আসিয়াছিল। যেদিন মুক্তি পাইলেন, সেদিন এই পৃথিবীকে এক অফুরন্ত ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। অনেক অল্প বয়স হইতেই তিনি বলিয়াছেন যে এই পৃথিবীর প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ তাহার চেয়ে বড় আর কোন আকর্ষণ কোন স্বর্গেও করিতে পারে না। তাঁহার সারা জীবনের কাব্য সাধনার মধ্যে পৃথিবীর প্রতি ভাল-বাসার মন্ত্রটি নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। নগর-জীবন-যাপনের পরে বাধাবন্ধহীন প্রকৃতির মধ্যে বাস করার প্রথম সুযোগ এই পদ্মার তীরেই তাঁহার আসিল। পৃথিবীকে তিনি উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে দেখিতে পাইলেন। এবং এত স্পষ্ট ভাষায় তিনি পৃথিবীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে সেকথা বুঝিতে আমাদের কোন সংশয় নাই। ১৮নং চিঠিতে বলিতেছেন যে, স্বর্গে কি পাওয়া যাইত তাহা না জানা থাকিলেও এই স্নেহ ভালবাসা আকাঙ্খাভরা এই মানুষগুলির মত ধন আর কোথাও পাওয়া যাইত না, এবং গাছপালা নদী মাঠ সবশুদ্ধ এই পৃথিবীটিকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে তাঁহার ইচ্ছা করে। প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো জড় বস্তু হিসাবে দেখেন নাই। তিনি মনে করিতেন প্রকৃতির ভিতরেও একটি অদৃশ্য প্রাণশক্তি আছে, যাহা আমাদের আঘাত করে এবং ভালবাসে। আমরা আমাদের কর্ম্মক্লান্ত মুহূর্ত্তগুলিতে এই প্রকৃতির কাছে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস খুঁজি। কবিচিত্তের আন্তরিক অভিমানে কবি এই প্রকৃতির কাছে একটু স্নেহের স্পর্শ পাইয়াই কেমন বিগলিত হইয়াছেন তাহারই বর্ণনা আছে ২৬নং চিঠিতে। কবির পরিতৃপ্ত সৌন্দর্য্যবোধ যে তাঁহাকে নানা অবস্থায় পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং নিজের প্রবল কল্পনায় তিনি যে পৃথিবীকে নানা রূপে মনে মনে সাজাইয়াছেন তাহার প্রমাণ ছিন্নপত্রের বহু চিঠির মধ্যে রহিয়াছে।

ছিন্নপত্রে আর একটি বিশিষ্ট ভাবনার প্রকাশ আছে। আমাদের জীবন একটি বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়। সৃষ্টির আদিম দিন হইতে যে প্রাণধারা যুগে যুগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহা একটি গভীর ঐক্যসূত্রে বদ্ধ। একটি অখণ্ড প্রাণের কেন্দ্র হইতে প্রাণের বহুমুখী প্রবাহ পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। কবি যেন অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারেন যে, একদিন এই সদ্যজাত পৃথিবী তাঁহাকে বুকে করিয়া লালন-পালন করিয়াছিল তাহারপর নানাভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জীবনের বিচিত্র প্রকাশের স্পর্শ বহন করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। আদিম পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মা হইয়া তিনি যে একদিন সূর্য্যালোক পান করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন "আমার এই যে মনের ভাব এ-যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত, পল্লবিত, সূর্য্য সনাথা আদিম পৃথিবীর

ভাব।" এই কথাই তিনি সমসাময়িক কালের কাব্য সৃষ্টির মধ্যেও বলিয়াছেন। অহল্যার প্রতি' কবিতা, সোনারতরীর 'সমুদ্রের প্রতি' এবং বসুন্ধরা কবিতায় এই অখণ্ড প্রাণ-প্রবাহের কথাটি কবি বিশেষভাবে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সকল জীবনদর্শনের মূলে এই কথাটি রহিয়াছে। সুতরাং ছিন্নপত্রের ৬৪ ও ৬৭ নম্বর পত্র কবির জীবনদর্শনের অন্যতম ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রোমাণ্টিক মনের আরেকটি ধর্ম অতীতবিলাস। যে সমস্ত লোক বস্তুজগতের নানা কাজের চাপে সদাসর্বদা ডুবিয়া আছে তাহারাও যখন এক মুহূর্তের অবকাশ পায় তখন বিগত দিনের স্মৃতি তাহাদের অলস মুহূর্তগুলিকে ভাব-মন্থর করিয়া তোলে। মানুষের মনের ইহা একটা স্বাভাবিক গতি। যাহারা বেশী কল্পনাপ্রবণ, যাহাদের মন দ্রুতসঞ্চরমান তাহারা যে অতীতের প্রতি আকর্ষণ আরো বেশী অনুভব করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনের অবচেতনে বহু ঘটনা, বহু দিনের স্মৃতি ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন প্রাসঙ্গিক কোন ঘটনার সংস্পর্শে বাসনালোক হইতে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও বলিয়াছেন যে, কবিতার জন্ম হয় সেই অনুভূতিগুলিতে যেগুলি অতীতের কোন ঘটনার রোমন্থন—"Emotions recollected in tranquility" পরিণত বার্ধক্যে এই অতীত রোমন্থন যত সুন্দর বলিয়া মনে হয়, পরিণত যৌবনে মনের এই অতীত মুখীতার সেরকম কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে আমাদের শিশুজীবনের দিনগুলি একটি অপূর্ব মোহজালের সৃষ্টি করে। পদ্মার তীরে রবীন্দ্রনাথের মনে তৎকালীন প্রকৃতি নানা সূত্রে শিশুজীবনের বিস্মৃত ঘটনাগুলিকে জাগাইয়া তুলিত। বেদনাবিলাসী কবি মনের এই বিচিত্র উপলব্ধিগুলিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ৫৬নং পত্রে বাহিরের জনশূন্য মাঠ, তৃণ-তরুশূন্য বালির চর আর চন্দ্রালোকিত রাত্রে নীলবর্ণ নদী দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িত—ছেলেবেলার সেই ভৃত্যশাসিত দিনগুলি। ভৃত্যশাসনে বদ্ধ শিশু যেমন মুক্তির জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিত, পরিণত যৌবনের রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই চঞ্চলতার স্পর্শ কিছু কিছু ছিল।

ছিন্নপত্রের আরেকটি লক্ষণীয় কথা, আত্মপ্রকাশের জন্য কবির আন্তরিক ব্যাকুলতা। যে-প্রকৃতি তাহার মনের উপরে নানা রঙের বৈচিত্র্যের সন্ধান প্রতিমুহূর্তে দিয়া চলিয়াছে, সে-প্রকৃতিকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবেন, এ-সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার অন্ত নাই। তখন তাঁহার জীবনে কবিত্বের এক গৌরবময় যুগ চলিয়াছে এবং কবিতা রচনার সংখ্যাও অন্যান্য যে-কোন যুগের চেয়ে অল্প নয়। সুতরাং আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা মহৎ কবিচিত্তকে সর্বদা পীড়িত করিয়াছে। অনেক সময় রুদ্ধ আবেগের বেদনায় প্রশ্ন করিয়াছেন "কতদিন থেকে কত লোক আমার মত এইরকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয় এ কিসের জন্য, এ কিসের উদ্বেগ, এই নিরুদ্দেশ, নিরাকুলতার নাম কি, অর্থ কি।" কিন্তু নিজের মনে একটি প্রশ্ন পোষণ করিয়াই তিনি খুশী হন নাই। সাহিত্যের কোন প্রকাশের মধ্যে তাঁহার মন তৃপ্ত হইতে পারে, এ-সম্বন্ধেও বলিয়াছেন "রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তাহলে জীবনটা এক রকম আনন্দে কেটে যায়।" স্বভাবতই পদ্মার তীরে গীতধর্মী কবির মনে ছন্দোবদ্ধ কাব্যরচনাই যে আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্টতম উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যখন পরবর্তীকালের কাব্যরচনার ধারার সঙ্গে ছিন্নপত্রের সুর আমরা মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করি।

কৌতুক-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

অজিতকৃষ্ণ বসু

কবি প্রশ্ন করেছেন ঃ "এ কি কৌতুক নিত্য নূতন, ওগো কৌতুকময়ি?" কবির এ প্রশ্ন চিরন্তন, কারণ, কৌতুকময়ীর তরফ থেকে এর কোনো জবাব মেলে না। অন্তরের ভেতরে বসে অহরহ মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নেওয়া ছাড়াও অনেক রকম কৌতুক করা কৌতুকময়ীর স্বভাব, তাই কবি যা বলতে চান তা অনেক ক্ষেত্রেই বলে উঠতে পারেন না। অবশ্য কবি যে এতে ভয়ঙ্কর রকম দুঃখিত, তা নয়। বরং কৌতুকময়ীর এই কৌতুক-লীলা তিনি পরম কৌতুকেই উপভোগ করেন। যা বলবেন বলে ভাবেন, বলতে গিয়ে তার রূপ যায় বদলে, 'চলার বেগে' যেমন 'পায়ের তলায় রাস্তা জেগে' ওঠে। ফলে শেষ পর্যন্ত নিজের সৃষ্টি দেখে কবি নিজেই বিস্ময়মুগ্ধ হন। কাব্য করে' বলা যায় ঃ

"মহা বিশ্ব সৃষ্টি করি' বিস্ময়ে মগন ভগবান;
কবিতার সৃষ্টি করি' তেমনি বিস্মিত কবি-প্রাণ।"

কি বলবো ভেবে বলা শুরু করে শেষ পর্যন্ত কি কি বলা হয়ে গেল, কি গড়তে গিয়ে কি গড়লাম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব ঠিক করে রওনা হয়ে শেষটায় কোথায় এসে পৌঁছলাম—এ সবই সেই কৌতুকময়ীর কৌতুক-লীলা।

কথিত আছে বিশ্ব সৃষ্টি করবার আগে ভগবান ছিলেন একা। একেবারে একা। এক সময় এই একঘেয়েমিতে তাঁর মহা বিরক্তি এসে গেল। তিনি দেখলেন বৈচিত্র্য না থাকলে জীবনে কোনো সুখ নেই। বৈচিত্র্যের আমদানী করে একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি বৈচিত্র্যবহুল বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। বিশ্বকে চালু করে দিয়ে তিনি দেখে চলেছেন চলমান বিশ্বের মহা তামাসা, আর মনে মনে উপভোগ করছেন পরম কৌতুক। বিশ্বসৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিশ্ব-বিধাতার কৌতুক-পিপাসা এবং কৌতুক-বোধ। সৃষ্টিতত্ত্বের এই মূল সূত্রটুকু গভীরভাবে অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি পেশাদার বা ছাপমারা দার্শনিক না হলেও জীবন-দার্শনিক কবি, এবং তাঁর কবি-সত্তা এবং জীবন-দর্শনের মূলে রয়েছে স্বয়ং বিশ্ব বিধাতার জীবন-দর্শনের মূল রূপটুকু। একটি মতাংশ উদ্ধৃত করে বলা চলে ঃ

"A transcendental, cosmic flavour permeates his humour——a reflection, as it were, of the Great Creator's feeling of fun at His own creation of the Universe. Even the tiniest bubble of his humour emanates from the depth of the Deep and is instinct with the same essential spirit".

এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে কৌতুক-রসিক বললে যথেষ্ট বলা হয় না। তাঁর কৌতুকবোধের মূলে রয়েছে জীবনের অনেক গভীরে—আপাত হালকা হাসির আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অশ্রুর গভীরতা, যাকে একজন কবি বলেছেন ঃ "Welcoming the same rose with a smile and a tear".

তাই বলি রবীন্দ্রনাথ শুধু কৌতুক-রসিকই নন, তার চাইতে আরো অনেক বেশী, তিনি কৌতুক-দার্শনিক। তাঁর কৌতুকবোধের সঙ্গে গভীর জীবন-দর্শন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বলেই তাঁর হাস্যকৌতুক বা ব্যঙ্গকৌতুক কোথাও অকরুণ, নির্মম, তিক্ত বা ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে নি।

রবীন্দ্রনাথ তাই প্রধানত হিউমারিস্ট, স্যাটায়ারিস্ট নন। তাঁর রচনায় সহৃদয় ব্যঙ্গ আছে, ব্যথা-হানা বিদ্রূপ নেই। অ্যাডিসন তাঁর 'স্পেকটেটর' কাগজে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

"The satire which only seeks to wound is as dangerous as arrows that fly in the dark. There is always an ethical under-current running beneath the polished raillery and the good-natured satire".

অর্থাৎ শুধু আঘাত দেওয়াই যে ব্যঙ্গ-রচনার উদ্দেশ্য; তা অন্ধকারে উড়ন্ত তীরের মতোই মারাত্মক। মার্জিত কৌতুক এবং সহৃদয় ব্যঙ্গের আড়ালে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন থাকে শুভকামনা।

রবীন্দ্রনাথের কোনো ব্যঙ্গ-রচনাই অ্যাডিসন-বর্ণিত আঘাত-প্রধান স্যাটায়ারএর পর্যায়ে পড়ে না। প্রথমে ধরা যাক তাঁর অসামান্য মঞ্চসফল এবং জনপ্রিয়তম "চিরকুমার সভা" নাটকটির কথা। এতে ব্যঙ্গ আছে। একদল চিরকৌমার্যব্রতী তরুণকে নিয়ে বেশ একটু তামাসা করা হয়েছে এ নাটকে। কিন্তু সে তামাসা কোথাও বিদ্রূপ হয়ে ওঠে নি। বরং এতে আগাগোড়া এমন নির্মল হাস্যরসের স্রোত বয়ে গেছে যে যাঁদের ঠাট্টা করা হয়েছে সেই শ্রীশ, বিপিন আর পূর্ণ স্বয়ং এসে এ নাটকের অভিনয় দেখলেও ক্ষেপে না উঠে বরং মজা উপভোগ করে' প্রাণ খুলে সকলের সঙ্গে হাসতে পারতেন। এই চিরকুমার সভার সভ্যদের জীবনেও রবীন্দ্রনাথ পরম কৌতুকে দেখেছেন সেই কৌতুকময়ীরই নেপথ্য কৌতুক-লীলা। ব্রতী তরুণদল চিরকুমার থাকবেন বলে কোমর বেঁধেছিলেন। কী তাঁদের নিষ্ঠা! কী তাঁদের উৎসাহ! কিন্তু একি করলে তুমি, ওগো কৌতুকময়ী? তাদের অমন গুরুগম্ভীর ব্রত অমন লঘুচপল ছন্দে ভেঙে দিয়ে তাঁদের বোকা বানিয়ে আমাদের হাসির খোরাক জোগালে? ভালো, ভালো, ভালোই করেছ তুমি। এমনি কৌতুক তুমি না করলে এই দুঃখের দুনিয়ায় আমরা হাসতাম কি নিয়ে?

তারপর ধরা যাক "বৈকুণ্ঠের খাতা"। কবিগুরুর এ নাটকটিও কৌতুকরসে ভরপুর। এর নায়ক বৈকুণ্ঠের একটি ভয়ংকর বাতিক তিনি তাঁর খাতা বোঝাই করে লেখেন, এবং যাকে হাতের কাছে পান তাকেই খাতা থেকে লেখা পড়ে শোনাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর এই খাতা যে অনেকের পক্ষেই ভীতির কারণ, সেটা সরলহৃদয় বৈকুণ্ঠ বুঝে উঠতে পারেন না বলেই শ্রোতা পাকড়াও করবার চেষ্টায় তাঁর কোনো কুণ্ঠা বোধ নেই। কুণ্ঠা নেই বলেই হয়তো তার নাম বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠ জাতীয় ব্যক্তি সংসারে খুব বিরল নয়, এবং এই বৈকুণ্ঠের মাধ্যমে তাঁদের সকলকে নিয়েই এ নাটকে কৌতুক করা হয়েছে বলা যায়। কিন্তু কৌতুকের লঘু হাসির আড়ালে প্রচ্ছন্ন আছে সহানুভূতির অশ্রু-গভীরতা। বৈকুণ্ঠের কুণ্ঠাহীন সরল বাতিক দেখে আমরা যে হাসি, সে হাসি উপহাসের হাসি নয়, হৃদয়-হারানো হাসি। বৈকুণ্ঠকে দিয়ে আমাদের হৃদয় জয় করিয়েছেন কৌতুক-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ। এখানেও সেই কৌতুকময়ীরই কৌতুক; এই কৌতুকের মায়াজালে আচ্ছন্ন বলেই বৈকুণ্ঠ বুঝতে পারেন না তাঁর হাস্যকর বাতিক তাঁকে লোকের কাছে কতখানি হাস্যাস্পদ বা উপহাস্যাস্পদ করে তুলছে। নিজের বাতিকের ছেলেমানুষিতা বৈকুণ্ঠ যদি বুঝতে পারতেন তাহলে কৌতুককর পরিস্থিতিগুলো গড়ে উঠত না, "বৈকুণ্ঠের খাতা" নাটকটিও আমরা পেতাম না।

"গোড়ায় গলদ" এবং তার পরিমার্জিত রূপ "শেষরক্ষা"-ও পরিস্থিতিমূলক হাস্যরস অথবা হাস্যকর পরিস্থিতির ওপরই গড়ে উঠেছে। কৌতুকময়ী এখানে যেন প্রাণের আনন্দে বিশৃঙ্খ কৌতুকের বান ডাকিয়েছেন। কিন্তু কৌতুক কোথাও শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে আঘাত বা বেদনা-দায়ক হবার দিকে এগোয় নি।

"অচলায়তন" নাটকটি রূপক বা সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে, কৌতুক-নাট্যের

পর্যায়ে নয়। কিন্তু এতেও রয়েছে কৌতুক। বাইরের পৃথিবী থেকে প্রাণপণে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে একটি আশ্রম, যার "চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।" তাই এর নাম অচলায়তন। এই অচলায়তনে অচলতার লক্ষ্মীকে অচলা রাখবার জন্যে প্রচণ্ড আইনকানুনী প্রচেষ্টা, এবং এখানকার ছাত্র আর অধ্যাপকদের চলা-ফেরা, কথাবার্তা, হাবভাব সব কিছুই আমাদের মনে প্রচুর কৌতুকের উদ্রেক করে।

আশ্রমটির বাইরে যেদিকে একজটা দেবীর মন্দির, সেদিকের জানালা খোলা নিষেধ। কেন নিষেধ সে বিষয়ে কারও জ্ঞানই সুস্পষ্ট নয়; নিষেধ যে আছে, সেটাই শুধু সবার জানা। আশ্রমের বালক ছাত্র সুভদ্র—এও বুঝি সেই কৌতুকময়ীরই কৌতুক—হঠাৎ একদিন নিষিদ্ধ জানালাটি খুলে ফেলেছে। অমনি "ঘরে ঘরে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।" সারা আশ্রম উঠল শিহরিত হয়ে। মহাপাপ করেছে সুভদ্র। কি হবে তার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত? অচলায়তনের আচার্য বহুদিন ধরে এই আয়তনের অচল তন্ত্রমন্ত্রেরই একনিষ্ঠ পূজারী। কিন্তু তাঁর মনেও সঞ্চার হলো কৌতুকময়ীর কৌতুক-লীলা। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত ঃ প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন নেই, অচলায়তনের নিষিদ্ধ বাতায়ন খুলে সুভদ্র কোনো পাপ করে নি।

শক্তি-পূজারীর মতে যেমন "সবই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা", তেমনি কৌতুক দেবীর পূজারী কৌতুক-দার্শনিক কবির ধ্যান-কল্পনায় "সবই সেই কৌতুকময়ীর কৌতুক।" নইলে কে ভাবতে পেরেছিল—অচলায়তনের গোঁড়ামি সাধনার সর্বোচ্চ সাধক এই আচার্যদেব নিজেই কি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর চিন্তাধারায় এমন অবিশ্বাস্য রকম একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে? পরিবর্তন তো নয়, এ যেন এক মহাপ্রলয়। কৌতুকময়ীর কৌতুকের যাদুস্পর্শে আচার্যের মনে হলো এতদিন কাটিয়েছেন শুধু সৌরভহীন ফলের ভার সেধে, সন্ধান করেন নি ফুলের ভারহীন সুরভি-সুষমার; মূল্যবান বলে ভেবেছেন দার্শনিক শুষ্ক জটিল তত্ত্বের বোঝাকে; বঞ্চিত থেকেছেন আর বঞ্চিত রেখেছেন তত্ত্বভারহীন স্বর্গীয় মাধুর্য থেকে। নিখুঁত থাকবার জন্যে এতদিনের কোমর-বাঁধা হুঁশিয়ারির কথা ভেবে এখন যেন খুঁতে খুঁতে করে উঠেছে মন। তাঁর মনের এই ঝড়ো আবহাওয়া যেন আশ্চর্যরকম রূপ পেয়েছে ছোট্ট এই কবিতা স্তবকে ঃ

"Ah, give me rather the fruitless fragrance of fluent flowers
Than the brute sweetness of dumb dissonant fruits.
Pine for no philosophy in my philharmonic towers,
Look not for me among Fortune's fond recruits.
No dull perfection for me, rather blunder on blunder,
Rather than miss the lightning, I'd face the thunder".

শেষ পংক্তিটিতে যেন ধ্বনিত হয়েছে অচলায়তনের প্রথম বিদ্রোহী বালক ছাত্র সুভদ্রের মনোভাব। উত্তরের বন্ধ জানালার ওপারের বিদ্যুৎ-চমক দেখবার জন্যেই সে যেন অনায়াসে প্রায়শ্চিত্ত-বজ্রের প্রচণ্ড ঝুঁকি মাথায় নিয়েছে। আর—কৌতুকময়ীর কি বিচিত্র কৌতুক! —ঠিক এই নিয়মভাঙা অপরাধের গুণেই আচার্যের সারা অন্তরের প্রীতি উজাড় হয়ে ঝরে পড়েছে অপরাধী সুভদ্রের মাথায়। আচার্য বলছেন সুভদ্র পাপ করে নি!!!

এরপরে আছে একাধিক গুরুগম্ভীর ব্যাপার, রূপকে আর সাংকেতিকতায় ভরপুর, যা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। আমরা শুধু লক্ষ্য করি অপূর্ব কৌতুকরস সারা নাটকটিতে ছড়িয়ে আছে—কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো প্রকট।

শুধু অচলায়তন নাটকেই নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রূপক এবং সাংকেতিক নাটকেও যেন নেপথ্যে বেজে চলেছে কবির কৌতুক-মুগ্ধ প্রশ্ন ঃ "এ কি কৌতুক, ওগো কৌতুকময়ী?"

শেক্‌স্‌পীয়রের "কিং লিয়ার" নাটকে গ্লস্টার বলছেন :

"As flies to wanton boys are we to the gods;
They kill us for their sport".

অর্থাৎ দুষ্টু ছেলেরা যেমন খেলার ছলে তামাসা করে মাছি মেরে ফেলে, মাছিদের যন্ত্রণার কথা একেবারেই ভেবে দেখে না, আমাদের প্রতি দেবতাদের ব্যবহারও তেমনি হৃদয়হীন।

মানব-জীবনের বিবিধ দুঃখ দৈন্য, ব্যর্থতা প্রভৃতি সম্পর্কে কবি-ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির মতবাদ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিদ্বান-সমালোচক বোনামী ডোব্রী বলেছেন :

"With Hardy the fault usually lies in the wanton, unseeing motion of the universe, of the *Immanent Will*, full of sound and fury, signifying nothing. It works *in spite of itself*, unconsciously, after the manner of an arganism".

এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা "দি ডাইনাস্ট্‌স্" নামক মহানাট্যকাব্যে টমাস হার্ডি লিখেছেন :

"In the foretime, even to the germ of Being
Nothing appears of shape to indicate
That cognizance has marshalled things terrene,
Or will (such is my thinking) in my span.
Rather they show that, like a knitter drowsed
Whose fingers play in skilled unmindfulness,
The Will has woven with an absent heed
Since life first was; and ever will so weave".

অর্থাৎ যে সর্ব-মৌলিক মহা-শক্তির * চালনায় জগৎ চলছে, তার জগৎ চালাবার নমুনা দেখে এমন মনে হয় না যে সে শক্তিটি বেশ ভেবে চিন্তে, ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় সঙ্গত, অসঙ্গত, সুন্দর-অসুন্দর, শোভন-অশোভন ইত্যাদি বিচার করে কাজ করছে। সে যেন ঝিমুতে ঝিমুতে বুনে চলেছে দক্ষ আনমনা হাতে। তার বোনার হাত পাকা, কিন্তু কি সে বুনছে সেদিক পানে তার নজর নেই।

টমাস হার্ডির রচনাবলী (গদ্য এবং পদ্য) সামগ্রিকভাবে তাঁর এই ধারণার রঙে রঙীন। এই ধারণাটি যেন তাঁর সৃজনী মানসকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। এই ধারণার ওপরে দাঁড়িয়েই তিনি জীবনের দিকে তাকিয়েছেন, এবং তাঁর জীবন-দর্শনও এরই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী টমাস হার্ডির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলাদা জাতের। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনও তাই বিভিন্ন। কৌতুক-দার্শনিক তিনি; তাঁর কৌতুক-দর্শনে অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে কৌতুকের মাধুর্য্যের সঙ্গে দর্শনের গভীরতার, দর্শনের ভার হালকা হয়েছে কৌতুকের শাখায় ভর করে। যে শক্তিকে তিনি অন্তরতম জীবনদেবতা রূপে কল্পনা করে প্রশ্ন করেছেন : "মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?" তারই কৌতুকময়ী রূপ কল্পনা করে আবার প্রশ্ন করেছেন "এ কি কৌতুক নিত্য নূতন ?"

শুধু হাসির ক্ষেত্রে, পটভূমিকায় বা পরিস্থিতিতে নয়, হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সর্ব ক্ষেত্রেই এই কৌতুকময়ীর লীলা-স্পর্শ অনুভব করেছে তাঁর কৌতুক-দার্শনিক কবি-চিত্ত। আমাদের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে কবির এই গভীর অনুভূতির দোলা।

* একেই টমাস হার্ডি Immanent Will (কখনো বা The Will) নামে অভিহিত করেছেন।

ধরা যাক কবিগুরুর "ভ্রষ্ট লগ্ন" কবিতাটি। বোধ হয় বলা বাহুল্য এটি হাসির কবিতা নয়। কোনো এক কোকিল-ডাকা ভোরবেলায় শিথিল কেশে নতুন মালা পরে' তরুণী নায়িকা যার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে বাতায়নে বসে ছিল, সেই তরুণ পথিক—গলায় তার মুক্তার মালা, মাথায় ঊষার আলোর ঝল্‌মল্ সোনার মুকুট—রাজরথে চড়ে এসে ব্যগ্রচরণে তারি দুয়ারে নেমে কাতরকণ্ঠে শুধালো "সে কোথায় ? সে কোথায় ?" (সে যে তারই প্রতীক্ষায় বাতায়নে বসে আছে, রাজার কুমার সে কথা জানে না।) নায়িকার অন্তরাত্মা চীৎকার করে বলে উঠতে চাইল "নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।" কিন্তু কৌতুকময়ীর কৌতুকে লজ্জা এসে বাধা দিল, নায়িকার বুক ফেটে গেল, তবু মুখ ফুটল না। কোনো সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে গেল নবীন পথিক।

যথাকালে এলো গোধূলিবেলা। নায়িকা কপালে সোনার টিপ পরে' কনকমুকুর হাতে কালোচুলে কবরী বাঁধছে। এমন সময় রথে চড়ে আবার এসে উপস্থিত করুণনয়ন তরুণ পথিক। তার বসনভূষণ ভরে গেছে ধূলায়; রথের ঘোড়াদের দেহ ঘর্মাক্ত, শ্রান্তিতে তাদের মুখ ফেনায় ভরে গেছে। ক্লান্ত চরণে নায়িকারই দুয়ারে নেমে তরুণ পথিক আবার কাতরকণ্ঠে শুধালো "সে কোথায় ? সে কোথায় ?"

কৌতুকময়ী আবার কৌতুক করে নায়িকার মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিলেন। নায়িকার মনে আবার ছেয়ে গেল সেই দুস্তর লজ্জা। আবার তার বুক ফেটে গেল, তবু আবার সে ব্যর্থ হলো মুখ ফুটে বলতে "শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।" আবার হতাশ হয়ে চলে গেল তরুণ পথিক।

তারপর.....এসেছে ফাগুন-যামিনী। নায়িকার ঘরে জ্বলছে প্রদীপ, বুকে এসে কেঁদে মরছে দখিনা বাতাস। বাসর গৃহ ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর। অগুরুগন্ধে সুরভিত দেহে জড়ানো ময়ূরকণ্ঠি। প্রিয়মিলন প্রতীক্ষায় নায়িকা বাতায়ন-তলে ধূলায় নেমে বসেছে, কিন্তু আর ফিরে আসবে না তার পরম বাঞ্ছিত সেই তরুণ পথিক। পথিক দু'বার যখন সাড়া নিতে এসেছিল তখন তাকে সাড়া দাও নি আর যখন পথিক আর ফিরে এলো না, আর ফিরে আসবে না, তখন তাকে ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাওয়াচ্ছ "হতাশ পথিক, সেযে আমি, সেই আমি।" একি কৌতুক তোমার, ওগো কৌতুকময়ি ?

মানবাত্মার সঙ্গে কৌতুকময়ীর এ কৌতুক চিরন্তন। ভ্রষ্টলগ্নের বেদনায় ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাওয়ার মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার চিরন্তন রূপটুকু ও অপরূপ।

মানবাত্মার তরফ থেকেই কবির প্রশ্ন :

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী !
বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ?
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী,..... "

এই মধুরহাসিনী সুন্দরী ও সেই কৌতুকময়ীরই আরেকটি রূপমাত্র। কবি বলেন "বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে।" বুঝতে পারবার কথাও নয়, কারণ এই কৌতুকময়ী সুন্দরী ও কবি কীট্‌স্-এর বর্ণিত La belle dame sans merci-র মতোই রহস্যময়ী।

কবিগুরু তাঁর ভাবলোকে মৃত্যুর অন্তরে ও এই কৌতুকময়ীকে অনুভব করে বলেছেন:

"অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
অত ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ!"

জীবনের নেপথ্যে মরণের আহ্ব-সংগীত বেজে চলেছে বলেই জীবনের এত মাধুর্য্য, এই গভীর সত্যটুকু ও এখানে পরোক্ষভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এই কৌতুকময়ীই দু'টি সূর্যকে দুবার প্রশ্ন করিয়েছিল—একই প্রশ্ন।

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
'কে তুমি?'
মেলে নি উত্তর।"

তারপর:

"বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
'কে তুমি?'
পেল না উত্তর।"

প্রশ্ন যে করিয়েছিল সে জানত উত্তর মিলবে না, এ প্রশ্নের উত্তর কোনোদিন মেলে না।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

পাঠশালা

ছোট বেলায় পৌরাণিক এক গ্রন্থের কাহিনীতে পড়েছিলাম যে কোন দেবতুল্য পুরুষ ছদ্মবেশে তাঁর ভক্তের মগজের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করতে এক উদ্ভট প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটা সঠিক মনে নেই তবে এই ধরণের ছিল বল্লে বোধ হয় খুব ভুল করা হবে না। "এক ব্যক্তি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে বিদেশে পত্নীগ্রহণ করে স্বল্পকাল তার সান্নিধ্যে থেকে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। বহু বৎসর পরে পর্যটনে আবার সেদেশে গেলে এক অতীব সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তার পাণিগ্রহণ করেন। পূর্ব পরিচয় না জানায় কেউ জানতে পারেনি যে তিনি ভুলক্রমে নিজের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। পরে তাঁদের যখন সন্তান হোল তখন সামাজিক নিয়মানুসারে এই ব্যক্তিকে তাঁর সন্তানের পিতা অথবা পিতামহ বলা হবে কি না?" এ যেন ইডিপাস্ এর গল্প উল্টে বলা। বুদ্ধিমান ভক্তের নিশ্চয়ই এই জটিল প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান করায় প্রসন্ন দেবতার কাছ থেকে বরলাভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হোত যে হিন্দু স্বামী ও তাঁর মুসলমান কি খৃষ্টান স্ত্রী—যাকে স্বামীর ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়নি, এমন দম্পতির সন্তানকে আমাদের সমাজে জাতের কোন পর্যায়ে ফেলা উচিত, তা হলে উত্তর দিতে এই ভক্তপ্রবরের মগজ ফাঁকা হয়ে যেত। এই রকম পরিস্থিতিতে পড়লে কি রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার উদাহরণ দেখেছিলাম পি, সি, দত্তের জীবনে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে জব্বলপুরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় বহু বৎসর বিপত্নীক ও সংসারে তাঁর আপনজন ছিল প্রায় পঁচিশটি কুকুর। তাদের এই বাড়ীতে সর্বত্র অবারিত গতিবিধি এমন কি প্রভুর খাবার টেবিলে কিংবা শয্যায় ও তাদের ছিল সমান অধিকার। কুকুরগুলির এই আধিপত্য দেখে আমি ইতস্তত করায় তিনি বল্লেন সমাজে মানুষের থেকে এদের সাহচর্য্য অনেক পবিত্র কারণ মানুষের বাইরেটা পরিস্কার দেখালেও তার অপরিচ্ছন্ন অন্তরের সান্নিধ্য সহ্য করবার মত ক্ষমতা সকলের হয় না। কুকুরের বাইরেটা অপরিস্কার বলে ও এরা অন্তর থেকে যেটুকু দেয় তা শুদ্ধ ও পবিত্র এবং সেটুকুকে গ্রহণ করা যায় নিঃসন্দেহে এবং অচল বিশ্বাসে। মানুষের সমাজের প্রতি তাঁর এই তীব্র বিতৃষ্ণার কারণ কি জিজ্ঞাসা করতে তিনি সংক্ষেপে জানালেন তাঁর জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে। ধনীর সন্তান পি, সি দত্ত যৌবনে উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি ইংরাজ মহিলার প্রেমে পড়ে তাঁকে বিবাহ করেন। এই পাপ কর্ম্মের দণ্ড হিসাবে তাকে তাজ্যপুত্র করে দেওয়া হয় এবং দেশে ফিরলে হিন্দু সমাজে তাঁকে আর গ্রহণ করা হয়নি। আইনত বিবাহ করায় তাঁরা স্বামী স্ত্রী পরস্পরে নিজ ধর্ম্ম বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁদের প্রথম সন্তান কন্যার জন্ম হলে তাকেও কোন ধর্মের বিধি অনুসারে চিহ্নিত করা হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কন্যা নয় বছর বয়সে মারা যায়। দত্ত মহাশয় তার দেহকে অগ্নি সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে গেলে সেখানে লোকেরা খৃষ্টান ও বিধর্ম্মী বলে তাঁকে বাধা দেয়। তখন তিনি গেলেন খৃষ্টানদের কবরস্থানে। কিন্তু সেখানেও তিনি খৃষ্টান নন ও তাঁর কন্যাকে ব্যাপটাইসড করা হয়নি বলে তারা কবর দিতে গররাজী হোল। মুসলমানদের কবরখানায় ও ঘোরতর আপত্তি পেলেন তাঁরা মুসলমান নন বলে। মৃত দেহটিকে সৎকারের জন্য নানাস্থানে টানাটানি করে ক্লান্ত এবং বিষাদ ও ক্রোধে ক্ষিপ্ত দত্ত মহাশয় এই ভীষণ সমস্যাকে মিটাবার হদিস পেলেন এক পাদ্রীর কাছে। তাঁর উপদেশে প্রথমে দত্ত মহাশয়কে খৃষ্ট-

ধর্মে দীক্ষিত করে পরে তাঁর মৃত কন্যার ব্যাপটিসম্ সম্পাদনে খৃষ্টানদের কবরে তার দেহ স্থানলাভ করল। এরপর সর্বধর্মে বীতশ্রদ্ধ দত্ত মহাশয়ের পত্নী বিয়োগ হলে মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করে তিনি কুকুরগুলির সান্নিধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন কারণ এদের সমাজে জাতধর্ম্ম বিচারের অত্যাচার নেই।

ভারতের সমাজ-ধর্ম্মের জন্য মনু যে বিধি দিয়েছিলেন তার আজকের স্বরূপে কতখানি তাঁর নিজস্ব বিধান বহন করছে বলা শক্ত। স্মৃতির স্বারা মনুর বিধিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রত্যেক বিধায়ক নিজের রুচিগত নীতি এর সঙ্গে জুড়ে মূলনীতিকে যে বিকৃত করেননি তার কি প্রমাণ আছে? এদেশের হিন্দু সমাজে স্ত্রী জাতিকে তথাকথিত মনুর বিধানে বন্দী রেখে সমাজপতিরা নিজেদের সুবিধামত ধর্ম্মের আইন বাঁচিয়ে এমন কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম নেই যা তাঁরা করেননি বা করছেন না।

আমার পিতামহ প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েই গতায়ু হন। তিনি সমাজ ও পৃথিবী থেকে এত শিগ্গির নিস্ক্রান্ত হবার জন্য তাঁর আশেপাশের ধর্ম্মভীরু আত্মীয় স্বজনরা নিশ্চয়ই বিশেষ স্বস্তি লাভ করেছিলেন। সেকালে যাঁরা ইংরাজী শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের অনেকে আহারান্তে পোর্ট মদিরা সেবনের অভ্যাসটাকে সে শিক্ষার আনুসঙ্গিক অবশ্য করণীয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পিতামহ ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেননি। সব সময়ে যে তিনি মদিরা সেবন করতেন তা সত্য নয় এবং এটাও মিথ্যা যে মাত্রারিক্ত পানের জন্য তাঁর মত্ত অবস্থা হোত। তাঁর সামান্য জমিজমায় যে প্রজারা কাজ করত তাদের তিনি আপনস্বত্ব দান করে দেন কারণ তাঁর মতে যারা রোদ্দুরে পুড়ে জলে ভিজে ফসল তৈরী করে জমির সম্পূর্ণ অধিকার কেবল তাদেরই হওয়া উচিত। কিন্তু সমাজের লোকদের ব্যাখায় তিনি মত্ত অবস্থায় এই অস্বাভাবিক দান খয়রাতে পত্নী ও একমাত্র সন্তানকে সম্পত্তির অধিকার চ্যুত করে আপন পরিবারকে উৎসন্নের পথে ঠেলে দিলেন। পিতামহের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল যে ঐ রকম মনোবৃত্তি নিয়ে তদানিন্তন সমাজে জন্ম নেওয়া। বর্তমান যুগে জন্মালে কে জানে তাঁর ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে হয়ত কম্‌সেকম্ একটা মন্ত্রিত্ব-লাভ ঘটে যেতে পারত।

পিতামহ একদিন সন্ধ্যায় পাল্কিতে বসিরহাট কাছারি থেকে নলকোঁড়ায় আপন গ্রামে ফিরছিলেন। পথে রোরুদ্দমানা এক মহিলা তাঁর শরণাপন্ন হোল। কোন ধর্মনীতিলঙ্ঘনে তার স্বামীকে সমাজচ্যুত করা হোয়েছিল। এখন সে মারা যাওয়ায় সামাজিক নিয়ম ভাঙতে ভীত লোকেরা তার সৎকারে সাহায্য করতে রাজী নয়। বেচারীর বছর দশেকের এক কন্যা ছাড়া সংসারে আর কোন সহায় ছিলনা। পিতামহের অনুরোধে তাঁর বেয়ারারাও এ মৃতের সৎকারে অগ্রগামী হোল না। তখন তিনি নিজে মহিলাটি ও তার কন্যার সাহায্যে এ শেষকৃত্য করবার আয়োজন আরম্ভ করলেন। বেয়ারারাও শেষে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। তাদের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল জাতিভ্রষ্ট হবার ভয়। এখন সেটা গেলে মনিবেরও জাত সেই সাথে যাবে কিন্তু চাকুরীটা বজায় থাকবে এই আশ্বাসে তারা এই অসমসাহসিক কাজ করতে রাজী হয়। সমাজে যখন পিতামহের এই দুস্কৃতির কথা রটে গেল শিখাধারী মনুবিদ্ পণ্ডিতদের বৈঠক বসল যে এঁকে শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী কি দণ্ড দেওয়া উচিত তার নির্দ্ধারণার্থে। উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করলে এই অধর্মের প্রশ্রয়ের জন্য জনসাধারণ অভিযোগ করবে যে ধর্মবিরুদ্ধ গর্হিত কর্মের জন্য শাস্তি কেবল গরীব অসহায়দের প্রতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে, সম্পদে বলিয়ানদের বেলায় সাতখুন মাপ হয়ে যায়। কিন্তু পিতামহকে সাজা দেওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল যে সেই সঙ্গে এই পণ্ডিতদের অনেকে তাঁর কাছ থেকে যে মাসোহারা সাহায্য পেতেন সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার

খুব সম্ভাবনা ছিল। এই নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় তাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থের সব পাতা চষে সর্বদিক বজায় রাখার মত উপায় খুঁজতে আরম্ভ করলেন এবং অচিরে আবিষ্কার করলেন যে শাস্ত্রের বিধানে উন্মাদের ধর্মবিগর্হিত কর্মের জন্য শাস্তি ব্যবস্থা নেই। সেই সঙ্গে এও লেখা আছে যে মদিরা পানে মানুষের সাময়িক উন্মত্ততা আসে। অতএব পিতামহ নিশ্চয়ই মত্ত অবস্থায় এই দুষ্কর্ম করে ছিলেন কাজেই ধর্মের আইনমত তাঁর অপরাধ মকুব করে দেওয়া হোল।

বর্তমান হিন্দুর সমাজে পূর্বেকার বিধির প্রকোপ কিছুটা হয়ত প্রশমিত কিন্তু অনুষ্ঠানের দিক থেকে আজও তার আড়ম্বর পূর্ণমাত্রায় বলবৎ আছে। অর্থবলের জোর থাকলে এ সমাজে ধর্মগ্রন্থির বন্ধনকে ঢিলে করে মুক্ত হওয়া ছেলেখেলার মত সহজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের হিন্দু সমাজধর্মের কাঠামোতে ঘুণ ধরে অন্তসারশূন্য হলেও তার পূর্বেকার রূপকে বাহ্যিকভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি দেখা যায় না। অধুনা কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ভাবে ধনী ও উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারের কন্যার সঙ্গে ইংরাজ ও ভারতীয়সম্ভূত মিশ্রবর্ণের খৃষ্টান পাত্রের বিবাহ হয়ে গেল। এই শুভকর্মে আহূত হয়েছিলেন শহরের মহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুল এবং তাঁদের যাজকত্বে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে পরিণয়সম্পন্ন করা হোল। বর্তমান যুগের প্রগতির দিক দিয়ে এঘটনাকে সামাজিক পরিবর্তনের একটা পরিচয় বলা যেতে পারে। কিন্তু সত্য বিচারে বোঝা যাবে যে অর্থের প্রতাপে বেদ ব্রাহ্মণকে কিনে হিন্দু সমাজধর্মের একটা চটকদার প্রহসন করা হোল। সাধারণ গরীব পরিবারে এই ধরণের বিবাহের যোগাযোগে পৌরহিত্য করত একমাত্র বিবাহ রেজিষ্টির দপ্তর। পুরানো দিনে কসবায় গ্রাম্যভাবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল সেকালের পাঠশালা। এই ধরণের বিদ্যায়তনে বঙ্গসন্তানের পিটিয়ে মানুষ করা হয়েছিল কত শতাব্দি ধরে। বিদ্যাশিক্ষার স্মৃতি যাতে অন্তরে কেটে বসে যায় তার জন্য এই পাঠশালাগুলিতে পড়ুয়াদের ভুল ত্রুটির জন্য শাস্তির রকমারি ব্যবস্থা ছিল। কসবার ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য একমাত্র পাঠশালাটিতে পূর্বেকার ঐতিহ্যগত ঠাটকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা হোত। ছেলেদের পড়ার চিৎকারে সরগরম এই বিদ্যায়তনে নৈমিত্তিক যে দৃশ্য দেখা যেত তাতে একে পাঠশালা না ভেবে যোগসাধনার ক্ষেত্র মনে করাটা খুব অসঙ্গত ছিল না। কেবল দেখা যেত কান ধরে দেওয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন ছাত্র, কেউ বা ঐ অবস্থায় হাটুতে এক পা উঠিয়ে অপর পা খানিতে ভর রেখে টলমল করছে। পণ্ডিত মশাইএর অধ্যাপনায় কোন দিন একটু বেশী রকমের চাড় হলে কারুর ভাগ্যে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিমায় দু হাটু ও এক হাতে সারা শরীরের ভার রেখে অন্য হাতখানিতে ধরে রাখতে হোত একটি ইট। ভারে অবশ্য হয়ে হাত নেমে গেলে আবার সেই হাতে চাপিয়ে দেওয়া হোত দুখানা ইট। সকল শাস্তির চেয়ে এরিষ্টোক্রেটিক ঐ সাজার নাম ছিল "নাড়ু গোপাল"। সাজা দেওয়ার মৌলিকত্বে সেকালের পণ্ডিত মশাইরা নিরো কি ক্যালুগুলাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে পারতেন। নামতা কি কবিতা ঘোষবার একটানা সুরের সাথে মাঝে মাঝে মারের চোটে পরিত্রাহি চিৎকারে চড়া ও খাদে মেশান এক বিচিত্র ঐক্যতানের সূত্রপাত হোত। পাড়ার নিষ্কর্মা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ যাঁরা জমিদারিচালে বাইরের বারান্ডা বা পুলের উপর বসে তাম্রকুট দেবীর আরাধনায় সময় কাটাতেন তাঁদের কানে এই কাতর রব পেঁছালে মুখে একটা পরিতৃপ্তি ভাব ফুটে উঠত। বোধ হয় তাঁরা এইভেবে খুসী হতেন যে "ছেলেরা গড়ে পিটে মানুষ হচ্ছে ভাল ভাবে"। এও এও হতে পারে যে তাঁরা তাঁদের বাল্যের অভিজ্ঞতা অন্যেরা এখন পাচ্ছে বলে একটা মজা উপভোগের আনন্দে হেসে নিচ্ছিলেন। পড়ুয়ারা এই রক্তমাংসের অনুভূতি দিয়ে মগজে প্রায় কোদাল ফেলে বিদ্যাচাষার জন্য পণ্ডিতকে দক্ষিণা দিত মাসে আট আনা। গরীব অভিভাবক পণ্ডিত মশাই এর দৃঢ় মনকে অনুনয়ে বা

অন্য কায়দায় নরম করতে পারলে দক্ষিণায় কিছু ডিস্‌কাউন্ট্‌ হয়ে যেত কিংবা অর্থের বদলে তার মূল্যাধিক চাল শাকসব্জির সিধা গ্রহণে তাঁর আপত্তি থাকত না।

জ্ঞান হওয়ার ও বুঝবার পর থেকেই জেনেছিলাম জগতে সবচেয়ে ভয়াবহ ও ভীষণাকৃতি হচ্ছেন শমন, কিন্তু তাঁকে দেখার পর অন্যকে তাঁর রূপ বর্ণনা দেবার সুযোগ এখনও কোন মানুষ পায় নি। পাঠশালায় ভর্তি হবার পর মনে হল যে মরজগতে শমনের সমকক্ষ ভয়ঙ্কর হচ্ছেন পণ্ডিত মশাই। তাঁর এক একটা সিংহনাদে ছাত্রদের বুক ধড়সে জঠরের তলায় গড়াগড়ি দিত। তাঁর সাদা তৈল সিঞ্চিত গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি ছিল যেন তাঁর মেজাজের আবহাওয়ার ব্যারোমিটার। তাঁর স্পন্দন ও নর্ত্তনের রকমফের প্রত্যেক পড়ুয়ার মনে আনত প্রত্যহ আশা আশঙ্কা ও হতাশা। পণ্ডিত মশাইএর শিখার সঙ্গে তালিম দিতে তাঁর বেতগাছা প্রত্যহ ছাত্রদের যত্নের প্রগাঢ় স্পর্শ পেয়ে শক্ত স্প্রিং-এর মত স্বক্রিয় ও মসৃণ থাকত।

একদিন একটি ছাত্রকে নিয়ে তার অভিভাবক এসে পণ্ডিতমশাইকে জানালেন যে বাড়ীতে সে নাকি বেয়াদবী করেছে এবং শাসনের ভয়ে পাঠশালায় সেদিন সে আসতে চাচ্ছিল না। এই অভিযোগের ফল যে কি ভয়াবহ তা শুধু দোষী ছাত্রটি নয় উপস্থিত সকলেই বেশ ভালভাবে জানত। ছেলেটি পাঠশালায় পৌঁছানার পর পণ্ডিতমশাইএর ক্রমাগত কাকুতিমিনতি করে যাচ্ছিল। তার এই অনুনয়কে উপেক্ষা করে তিনি তাকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থাকে বেশ একটা বিলম্বিত খেয়ালে প্রস্তুত করাচ্ছিলেন। একজনকে তিনি পাঠালেন পাঠশালার অপর প্রান্তে অন্দরমহলে একটি সরষের তেল আনবার জন্য এবং সেটা না পৌঁছান পর্যন্ত সকলকে বেতখানার ডগাটা ধরে বেঁকিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে তার আছড়ে পড়ার তেজ পরীক্ষা করাচ্ছিলেন। সমস্ত পাঠশালা হয়ে গেছে স্ত ধ, ঝড় আসবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যেমন সারা প্রকৃতি নীরব হয়ে পড়ে। ছেলেটি নিস্তার পাবার আশায় ক্রন্দন নিষ্ফল বুঝে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এরপর পণ্ডিত মহাশয় তার কোঁচাটি ধরে একটান দিয়ে ধুতি খুলে লম্বালম্বীভাবে সেটাকে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি করে নিলেন। ছেলেটিকে হাত পিছনে করবার হুকুম দিলে সে শেষবারের মত করুণভাবে ক্ষমা চাইল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ধমক আসায় তার হাতদুটি যেন আওয়াজের ধাক্কায় পিছনে একজোট হয়ে গেল। ধুতির দড়িতে কব্জি দুটি বেঁধে ঘোড়ার লাগামের মত তার দুই বাহুসন্ধি ও কাঁধ গ্রন্থিবদ্ধ করে অপর প্রান্তটি ছুঁড়ে কড়িকাঠে টপকিয়ে নেওয়া হল। তারপর ধীরে সেই প্রলম্বিত টেনে ছেলেটিকে উঁচুতে ঝুলান হল। বাজীকর যেমন নানা কায়দায় সাজ সরঞ্জাম সাজিয়ে আসল খেলা শুরু করার আগে দর্শকের কৌতূহলের মাত্রাটা কতখানি তীব্র হয়েছে তার আন্দাজ করার চেষ্টা করে, পণ্ডিত মশাই ঠিক তেমনিভাবে তাঁর এই আয়োজন পড়ুয়াদের সকলকে কতখানি ভয়াভিভূত করেছে তা জানতে জ্বলন্ত চাউনি দিয়ে চারিদিকে একবার দেখে নিলেন। তারপর শূন্যে বার দুয়েক বেতটি আস্ফালন করে আবার আঘাত করলেন ছেলেটির শরীরে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বিদারক তার আর্ত্তনাদ উপস্থিত সকলের স্নায়ুকে যেন ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। এরপর চলল সেই দোদুল্যমান মাংসপিণ্ডবৎ দেহে ছন্দে তালে আঘাতের পর আঘাত এবং তার প্রতি আক্ষেপে উত্থিত অসহ্য কাতরোক্তির উচ্চরব। কিছুক্ষণ পরে বেয়াদবীর মাত্রানুযায়ী সাজার পরিমাপমত বেত্রাঘাত করে ক্লান্ত পণ্ডিত মহাশয় ক্ষান্ত হলেন। পেণ্ডুলামের মত দোল খাওয়া দেহটি স্থির হলে ধুতির বাঁধন খুলে ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে দাঁড় করান হল। সে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু পণ্ডিত মশাই বেত ফের উঁচু করতেই তার অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে প্রাণপণে একত্রিত করে কোনমতে সে দাঁড়াল। তার হাতে ধুতিখানা দিয়ে পরতে বলা হল। সাময়িকভাবে নির্বুদ্ধি ও ক্রিয়াহীন শুধু কাপড় খানা হাতে করে তখনও যেন কোন অদৃশ্যযষ্ঠির ছন্দে বাঁধা বিরামহীন

আঘাতের আক্ষেপে সে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। তখনকার দিনে বয়োজ্যেষ্ঠরা বেদম প্রহারকে ছেলেদের চরিত্র সংশোধনের ও জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করবার একমাত্র উপায় ধরে নিলেও ছাত্রকে এমন মারাত্মক সাজা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে চাক্ষুষ দেখলে তাঁদের অনেকেই হয়ত অনুমোদন করতেন না। কিন্তু "ষষ্ঠি পরিত্যাগে ছেলেদের নষ্ট স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া" নীতির প্রভাব তখন এত প্রবল ছিল যে এমন নিষ্ঠুরতায় মনে আঘাত পেলেও এই অভিভাবক প্রকাশ্যে পণ্ডিতকে বাধা দিতে সাহস পাননি। ধুতিখানা ছেলেটির গায়ে জড়িয়ে দিয়ে পণ্ডিত মশাইএর অনুমতি নিয়ে তিনি তাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। এরপর তাকে এ পাঠশালায় আর আসতে দেখা যায়নি। এই ঘটনার পর ঐ ভয়াবহ পরিবেশে যাতে আর না যেতে হয় তার জন্য বাড়ীতে অনেক অনুনয় করলাম। কিন্তু রেললাইনের ওপারে দূরে বড় স্কুলে হেঁটে যাবার মত বয়েস না হওয়া পর্যন্ত এই পাঠশালা ছাড়া ছোটদের অন্য গতি ছিল না। বয়েসের একটি গণ্ডি পার হলে বাড়ীতে ছোটদের সর্বক্ষণ উপস্থিতি বড়দের কাছে অসহ্য ছিল কাজেই সাময়িকভাবে তাদের বন্দী করে দেওয়া হোত ঐ শাসনের কারাগারে। বড়দের বদ্ধ ধারণা ছিল যে ছেলেদের এর বাইরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে তাদের উৎসন্নে যাবার সোজা রাস্তা কাজেই পাঠশালায় নির্মম প্রহারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে যে কোন সহানুভূতি অর্জনে রেহাই পেয়ে যাব তা ছিল দুরাশা। কিন্তু পরিত্রাণ এল কয়েকটি ঘটনার দ্রুত বিবর্তনে।

আ লো চ না

রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও রাগিণীর বিচার

রবীন্দ্র সংগীত রসিকদের কাছে একটি অপরাধ করতে বসেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছিলেন, "গানের কাগজে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে সেটা বলবার কোনও দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটাই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে সেই দশের মধ্যে মিল না থাকতে পারে।" এই উক্তিকে আপাততঃ অমান্য করছি। আমাদের মতে এই উক্তি সমগ্র ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সুতরাং যখন রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে রাগরাগিণীর নাম খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন অন্যায় একটা হচ্ছে বৈকি!

খালি একটি সান্ত্বনা। সেটি হল এই যে আমাদের আগে অনেক রবীন্দ্রসংগীত সমালোচকেরাও এই দুষ্কার্যটি করে গিয়েছেন। অনেক স্বরলিপির পুস্তকেও সুরের নাম ছাপা হয়েছে। আলোচনা প্রসংগে, শ্রীশান্তিদেব, সৌমেন্দ্রনাথ, নারায়ণ চৌধুরী বা ধুর্জটীপ্রসাদ প্রমুখ সমালোচকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই গানবিশেষের রাগ রাগিণীর নির্দেশ দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং আমাদের আলোচনা হয়তো কতকটা অন্যায় কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এ ছাড়াও একটা কথা আছে। কোনও জিনিষের রূপ বোঝাতে হলেই সাধারণ্যে সেই রূপের গোষ্ঠী বিচারের একটা ষ্ট্যান্ডার্ড বা মান থাকা দরকার। সেটা অনেক কথায় বর্ণনা না করে নাম দিয়ে পরিচয় দেওয়া যায়। কিন্তু সুরের রূপ বর্ণনার জন্যে সহজ কোনও পথ থাকলেই মানটি যথার্থ ফুটে ওঠে। সুরের রূপ বর্ণনা এক হয় নাম দিয়ে, যার পরিচিতি নিয়ে গোলযোগ হতে পারে,—অপর দিকে হতে পারে স্বর সমষ্টির কষ্টি পাথরে, নাম তার যাই হোক না। অর্থাৎ আমি যাকে বলি খাম্বাজ তাকে হয়ত কেউ ঝিঁঝিট বলে চিনে থাকতে পারে। সেখানে নামের গোলযোগ, রূপের নয়। আমরা রূপের বর্ণনা করব খণ্ডমেরু ও মাতৃকার মাধ্যমে। সুরের সত্যতা তার খণ্ডমেরু ও মাতৃকা স্বরগুচ্ছের মধ্যে। এই মানটি সুরের মধ্যে চরম সত্য। তাই আমাদের বক্তব্য পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত ইংরাজীতে রাগ ও রাগিণী গ্রন্থে এই খণ্ডমেরু ও মাতৃকা শব্দ দুটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। খণ্ডমেরুর অর্থ মেরুর খণ্ড। মেরুর অর্থ হল কোনও বস্তুর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। সংগীতের মেরু হল সুরের মেরু। একটি সা থেকে স্বর উঠে নি পর্যন্ত পৌঁছবার আগে পর্যন্ত সবশুদ্ধ ১২টি স্বর পার হতে হয় যেমন—স ঋ র জ্ঞ গ ক্ষ ম প দ ধ ণ ন, ঋ থেকে র্স, র থেকে র্র ইত্যাদি। প্রত্যেক ১২টি স্বর নিয়েই এক একটি মেরু। এই মেরুর মধ্যে যে কোনও খণ্ডকেই এক একটি খণ্ডমেরু বলা হয়।

রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ। রাগ সম্পর্কে এই একান্ত সত্যটুকু আলোচনা করে দেখলে প্রথমেই "রঞ্জন" কথাটির অর্থ সংগীতসুরের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন। স্বরের সম্বাদী ও অনুবাদী সম্বন্ধ এই রঞ্জন শক্তিকে কেন্দ্র করেই স্থাপিত হয়েছে। একটি সম্বাদী সম্পর্ক ও দুইটি অনুবাদী সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পন্ন তিনটি স্বরের গঠনে যে খণ্ডমেরুর উৎপত্তি হয়

সেগুলি বিশেষ রঞ্জন শক্তিসম্পন্ন এবং যে কোনও গীতিকর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োগ বহুল খণ্ডমেরুটি সেই গীতিকর্মের রাগ রাগিণী গঠনে সাহায্য করে। এইরূপ দুটি খণ্ডমেরুর সংযোগে দুটি সম্বাদী সম্বন্ধ ও তিনটি অনুবাদী সম্বন্ধ বিশিষ্ট চার স্বরে গঠিত স্বরগুচ্ছকে "মাতৃকা" বলা হয়। মাতৃকার অর্থ হল ছোটো মাতা অর্থাৎ রাগ রাগিণীর জন্মদাতা,—ডাঃ সান্যাল ইংরাজীতে মাতৃকার প্রতিশব্দ করেছেন "মোটিফ্"।

যে গীতিকর্মের মধ্যে যে খণ্ডমেরু ও যে মাতৃকার ব্যবহার যত প্রবল সেই মাতৃকা বা খণ্ডমেরুটিই সেই গীতি কর্মের রাগ নিয়ামক। যদিও অপেক্ষাকৃত অপ্রধান খণ্ডমেরু ও মাতৃকা গুলিও রাগ রাগিণীর গঠনে অংশ গ্রহণ করে। স্বর বিশেষের বা গুচ্ছ বিশেষের প্রয়োগ বহুলতা যাচাই করে যখন রাগ রাগিণী বিচার করা হয় তখন গীতিকর্মের স্থায়ী অংশটুকু অর্থাৎ যে অংশটুকু অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহারের রীতি তারই মধ্যে থেকে আমাদের রাগ রাগিণীর বিচার করতে হবে। ডাঃ সান্যাল বলেছেন রাগ রাগিণী বিচারের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে এরই মধ্যে। আমাদের মতে রবীন্দ্র সংগীত বিচারে এর চেয়েও যথাযথ ভিত্তি আর হতে পারে না। কেন তাই বলি।

রবীন্দ্র সংগীত তার প্রকাশিত স্বরলিপির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাতে যে সুর গ্রথিত হয়েছে প্রয়োগ শিল্পীর তার থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় নেই। এবং হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির মতন তানের সাহায্যে রাগ বিস্তার করে তার আসন অধিকার করবার উপায় নেই রবীন্দ্রসংগীতে। গানের ভেতরে অনেকগুলি মাতৃকার অস্তিত্ব থাকলেও সর্বাপেক্ষা প্রয়োগ বহুল মাতৃকাটি আগে থেকেই চিহ্নিত করা হয়ে আছে। একটা উদাহরণ নিলেই কথাটি পরিষ্কার হবে। "ওরে সাবধানী পথিক" গানটির স্থায়ী অংশ বিশ্লেষণ করলে এইরূপ দাঁড়ায়,—

স্বরের ব্যবহার	বাদীস্বর	খণ্ডমেরুর ব্যবহার	মাতৃকার ব্যবহার	স্থায়ী অংশের শতকরা কত ভাগ
স—৩		সগপ—১৮½(২)	সপমধ—২৪½(১)	৬৮%
র—৩½		রমধ—১৫½ } ৩	সগপধ—২২(৩)	৬১%
গ—৯½	গ	গপনি—১৫½ }	সগপন—১৮½	
ম—৮½		মধস—১৫	সরমধ—১৮½	
প—৬		পনির—৯½	রমপণ—২০(৪)	৫৯%
ধ—৩½		ধসগ—১৬(১)		
ণ—২		ণরম—১৪		
ন—০				
৩৬				

এখানে সগমধ মাতৃকার ব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ডাঃ সান্যালের বিশ্লেষণে প্রমাণ হয়েছে যে যত প্রসিদ্ধ গান খাম্বাজ আখ্যায় প্রচলিত হয়েছে তার বেশির ভাগেরই বৈশিষ্ট হল প্রধান মাতৃকা সগমধ ও প্রধান ও দ্বিতীয় খণ্ডমেরু যথাক্রমে মধস ও ধসগ। এই আলোচ্য গানখানি সগমধ প্রধান মাতৃকা হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধ খাম্বাজ হয়ে ওঠেনি তার কারণ এখানে প্রধান মাতৃকা সগপ।

হিন্দুস্থানী সংগীত বিশারদের পক্ষে এই গানটির স্থায়ী অংশটুকুর প্রয়োগকালে প্রচলিত পদ্ধতি মত তান কর্তবের মাধ্যমে সগমধকে দাবিয়ে রেখে সগপধকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও

নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি তাই আমাদের কাছে হিসাবের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত যার ভিত্তিতে পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের বিচার পদ্ধতি এই পরিসংখ্যানেরই ভিত্তিতে।

তবে একটি কথা আছে। সেটি হল এই নামকরণ নিয়ে। মাতৃকা স্বরগুচ্ছের মান দিয়ে গানগুলিকে গোষ্ঠী ভুক্ত করা সম্ভব হলেও নাম নিয়ে গোলোযোগ হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের নামের ভিত্তি প্রয়োগ বহুল মাতৃকা ও প্রয়োগ বহুল খন্ডমেরুগুলিকে কেন্দ্র করে, তাই নামের ভুল হলেও গোষ্ঠীর ভুল হওয়া সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ গানগুলির পরিচয় যাচাই করে আমরা প্রত্যেক রাগ রাগিণীর মাতৃকা ও খন্ডমেরুগুলি নির্দ্ধারিত করে ফেলেছি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ভৈরবী, তোড়ী ও ভৈঁরো রাগ রাগিণীর উপর রচিত গানের বিচার করবো। প্রথমে এদের পরিচয় দেওয়া যাক,—

	প্রধান মাতৃকা	খন্ডমেরুর ক্রম
ভৈঁরো —	সঋমদ	মদস (১) রমদ (২)
ভৈরবী —	সজ্ঞমদ	দসজ্ঞ (১) মদস (২)
তোড়ী —	সজ্ঞপদ	সজ্ঞপ (১) দসজ্ঞ (২)

এই প্রসঙ্গে রামকেলী, পরজ, কালেংড়া, আহিরী প্রভৃতি সুরগুলির বিশ্লেষণ করলে অবশ্য ভাল হত কিন্তু এদের সুক্ষ্ম বিভেদ নিয়ে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন হবে বলে আপাততঃ সে প্রসঙ্গ বন্ধ থাকুক।

আমাদের বিচারের মধ্যে সুক্ষ্মতর অংশটুকুও আপাততঃ তুলে রেখে মোটামোটি মাতৃকা বিচার করবো।

গান	প্রধান খণ্ডমেরু	প্রধান মাতৃকা	স্বরলিপির প্রাপ্তিস্থান	রাগরাগিনীর নামকরণ	নামকরণ কর্ত্তা
১। জানিহে যবে প্রভাত হবে	দসজ্ঞ	সজ্ঞমদ	স্বরবিতান-৪	ভৈরবী	স্বরলিপি কার
২। কেমনে ফিরিয়া যাও	সজ্ঞপ	সজ্ঞমদ	স্বরবিতান	ভৈরবী	*শান্তিদেব ঘোষ
৩। ভেঙেছো দুয়ার এসেছো	দসজ্ঞ	সজ্ঞপদ ও সজ্ঞমদ	স্বরবিতান	ভৈরবী	ঐ
৪। যেথায় থাকে সবার অধম	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	ঐ	ঐ	ঐ
৫। হে নূতন দেখা দিক আরবার	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	ঐ	ঐ	ঐ
৬। কাহার গলায় পরাবি	সজ্ঞপ	সজ্ঞমদ	ঐ	ঐ	ঐ
৭। অসীম কালসাগরে	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	স্বরবিতান-৮	ঐ	স্বরলিপি কার
৮। তোমারে জানিনা হে	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	ঐ	ঐ	ঐ
৯। তোমার পতাকা যারে দাও	সজ্ঞপ	সজ্ঞমদ	স্বরবিতান-৪	ঐ	ঐ

গান	প্রধান খণ্ডমেরু	প্রধান মাতৃকা	স্বরলিপির প্রাপ্তিস্থান	রাগরাগিনীর নামকরণ	নামকরণ কর্ত্তা
১০। হে ক্ষণিকের অতিথি।	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	স্বরবিতান	ঐ	(ক) নারায়ণ চৌধুরী
১১। আলোকেরি ঝর্ণা ধারায়।	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	ঐ	ঐ	ঐ
১২। প্রথম আলোর চরণধ্বনি	সজ্ঞপ	সজ্ঞমদ	স্বরবিতান	তোড়ী-ভৈরবী	লেখক
১৩। আয়রে মোরা ফসলকাটি	দসজ্ঞ	সজ্ঞমদ	ঐ	ভৈরবী	ঐ
১৪। যখন ভাঙলো মিলন মেলা	দসজ্ঞ	সজ্ঞমদ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫। মরণের মুখে রেখে	সজ্ঞপ	সজ্ঞমদ	ঐ	তোড়ী-ভৈরবী	ঐ
১৬। চরণ রেখা তব	দসজ্ঞ	সজ্ঞমদ	স্বরবিতান-২	ভৈরবী	ঐ
১৭। চরণ ধরিতে দিওগো	দসজ্ঞ	সজ্ঞমদ	স্বরবিতান	ঐ	ঐ

আমরাও নামকরণ করবার চেষ্টা করেছি। এবং ১২ থেকে ১৭ সংখ্যক গানগুলি তারই দৃষ্টান্ত। আমাদের নামে অবশ্য ভুল হতে পারে কিন্তু মাতৃকার বিচারে ভ্রান্তি নেই এবং আমাদের মতে ১, ৩, ১৩, ১৪, ১৬. ১৭ সংখ্যক গানগুলি; ২, ৬, ৮, ৯, ১২, ১৫ সংখ্যক গানগুলি এবং ৪, ৫, ৭, ১১ সংখ্যক গানগুলির বিভিন্ন রাগবৃত্তি ধরা পড়েছে। এই সঙ্গে আরও কয়েকটি গানের মাতৃকা বিচার করে আমরা ৪, ৫, ৭, ১০, ১১ সংখ্যক গানের রাগ নির্ণয় করবো।

গান	প্রধান খণ্ডমেরু	প্রধান মাতৃকা	স্বরলিপির প্রাপ্তিস্থান	রাগরাগিনীর নামকরণ	নামকরণ কর্ত্তা
১৮। রজনীর শেষ তারা	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	স্বরবিতান-১৪	তোড়ী	স্বরলিপিকার
১৯। প্রভাতে বিমল আনন্দে	দসজ্ঞ	সজ্ঞপদ	স্বরবিতান-২৩	গুর্জরী	ঐ
২০। দুখ দিয়েছ দিয়েছ ক্ষতি নাই	সজ্ঞপ	সজ্ঞপদ	স্বরবিতান-৮	তোড়ী	ঐ
২১। ভব কোলাহল ছাড়িয়ে	সজ্ঞপ	সজ্ঞপণি	স্বরবিতান-৮	তোড়ী	ঐ
২২। তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে	সজ্ঞপ	সজ্ঞপণি	ঐ	দেশী তোড়ী	ঐ
২৩। নূতন প্রাণ দাও	সজ্ঞপ	সজ্ঞপণি ও সজ্ঞপদ	স্বরবিতান-৪	নাচারী তোড়ী	ঐ
২৪। গাও বীণা গাও গাওরে	মদস	সজ্ঞপদ	ঐ	মিশ্রতোড়ী	ঐ

* শান্তিদেব ঘোষ লিখিত 'রবীন্দ্রসংগীত'

(ক) নারায়ণ চৌধুরী লিখিত 'সংগীত পরিক্রমা'

এখন অবশ্যই আমরা ৪, ৫, ৭, ১০, ১১ সংখ্যক গানগুলিকে ১৮, ২০ ও ২৪ সংখ্যক গানের সমপর্যায়ে ফেলতে পারি এবং তোড়ীর সঙ্গে অপর মাতৃকার প্রাধান্য লাভে গড়ে ওঠা ১৯, ২১ ও ২২ সংখ্যক গানের সঙ্গে ২, ৬, ৮, ৯, ১২, ১৫ সংখ্যক গানগুলিকে সমপর্যায় ভুক্ত করতে পারি।

সুরের নামকরণ যদি করতেই হয় তার একটা ষ্ট্যান্ডার্ড থাকা প্রয়োজন বইকি। ভৈরবী গানের বিচার প্রসঙ্গে যদুভট্ট প্রণীত একটি গানের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। গানটির কথা হল "নাদ পরম বিদ্যা" রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সংগীত মঞ্জরী" গ্রন্থের স্বরলিপি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেখানেও প্রধান খন্ডমেরু দসজ্ঞ ও প্রধান মাতৃকা সজ্ঞমদ। সুরের নামকরণের একটা বিশিষ্ট মান না থাকলে গোলোযোগ হওয়া স্বাভাবিক। উপরের উদাহরণ-গুলির মধ্যে সেটা দেখাবার চেষ্টা করেছি। "ঐ মহামানব আসে" গানখানির সুরের নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর "রবীন্দ্রসংগীত" গ্রন্থে এক জায়গায় বলছেন ভৈরবী অন্য জায়গায় বলছেন ভৈঁরো। স্বরলিপি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল গানটির প্রধান খন্ডমেরু দসজ্ঞ ও প্রধান মাতৃকা "সজ্ঞপদ"। শান্তিদেব বাবুর বিচারে হয়ত সন্দেহ থাকতে পারে আমাদের মতে এই গানটি ভৈরবী সুরের ভিত্তিতে গঠিত। অবশ্য যদি প্রধান খন্ডমেরু ও মাতৃকার বৈশিষ্টের আমাদের নামকরণ গ্রাহ্য হয়।

যে সব সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান তুলে ধরে তাঁর ভৈরবী সুরারোপের প্রশংসা করে থাকেন তাঁদের বিচার যে কতখানি ভ্রমাত্মক সেটা প্রতীয়মান হতে এর পর আর বিশেষ দেরী হয়না। এই ভুলের কারণ হল রাগ নিরূপণের ভ্রমাত্মক চলতি পদ্ধতি। এই ভুল যে কত সহজেই হতে পারে তার উদাহরণ দেওয়া যাক। ভৈরবীর পর্দাগুলি হল যথাক্রমে সা ঋ জ্ঞ ম প দ ণ-এর ভেতর অন্য পর্দাও অবশ্য লাগানো যেতে পারে কিন্তু আদর্শ হিন্দুস্থানী মত এই। আমাদের বিচারে এর খন্ডমেরুগুলি হল সজ্ঞপ, ঋমদ, জ্ঞপণি, মদস, দসজ্ঞ মাতৃকাগুলি হল সজ্ঞপদ, সজ্ঞমদ, সঋমদ ও সজ্ঞপণি। উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি অনুসারে গাইবার আগেই গায়ক বলে দিলেন যে তিনি ভৈরবী গাইছেন। গান আরম্ভ করবার পর তাঁর পক্ষে বিশেষ সচেষ্ট হয়ে দসজ্ঞ ও সজ্ঞমদ-র প্রাধান্য রেখে গাওয়া যেমন সহজ হতে পারে আবার সুরের জালে বিভোর হয়ে যে কোনও খন্ডমেরু বা মাতৃকার প্রাধান্য রেখে গান করাও তেমনি সম্ভব। এখানে ভাল বা খারাপ গান বা শিল্পীর গুণ বা দোষ কীর্ত্তন করছি না কেন না শিল্পীর গুণ বা গানের মাধুর্য তার সঠিক সুরের প্রয়োগ ক্ষমতার মধ্যে নয় আসলে উভয়ের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে সুরের রঞ্জন শক্তির প্রাধান্যের ওপোরে। কিন্তু এখানে আসল কথা হল এই যে বিভিন্ন গানের সুরের রাগ রাগিণীর রূপ বিভিন্ন কণ্ঠের মাধ্যমে ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসে যা দাঁড়ায় তার হয়ত ভৈরবী নাম থেকে যায় সুরের ছাঁচ যায় বদলে। এরই ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় একই সুরের নামে বিভিন্ন রূপের প্রচলন আছে। আমাদের সমালোচকরাও এই বিভ্রান্তির মধ্যে বোধহয় হারিয়ে গেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাছে ভৈরবীর রূপের প্রাধান্য রাখার কোনও প্রয়োজন হয়নি। স্বতস্ফুরিত সুরের উৎস তাঁর সঙ্গীত শাস্ত্র অনুশীলনের অর্জিত বিদ্যার থেকে প্রায় সর্বক্ষণই দূরে থেকেছে। তার ছাপ গিয়ে পড়েছে গানের সুর দেওয়ার ওপোর।

ভৈঁরো সুরের সরগম হল স ঋ গ ম প দ ন। এই পর্দা কয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার খন্ডমেরুগুলি হল সগপ, গপনি, ঋগদ, গদনি, ঋমদ, মদস। মাতৃকাগুলি হল সগপনি, সঋমদ ও ঋগদনি। ঠিক এই ছকের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান আমরা পর্যালোচনা করেছি তার উদাহরণ তুলে ধরলেই সুরারোপে রবীন্দ্রনাথের গতিপথ কিছুটা বোধগম্য হয়।

২৫। শুভ্র আসনে বিরাজো গানখানি স্বরলিপিতে ভৈঁরো বলে লেখা আছে। এই গানখানির খন্ডমেরু ব্যবহারের ক্রম হল মদস, ঋমদ, সগপ, ঋগদ, গপনি, গদনি। মাতৃকার ক্রম হল,—সঋমদ, ঋগদনি, সজ্ঞপনি।

২৬। মোরে ডাকি লয়ে যাও—শান্তিদেববাবু বলেছেন রামকেলী খন্ডমেরুর ক্রম—মদস, সগপ, গদনি, ঋগদ, গপনি, ঋমদ। মাতৃকার ক্রম—সগপনি ও সঋমদ, ঋগদনি।

২৭। ব্যাকুল বকুলের ফুলে—খন্ডমেরুর ক্রম—গদনি, মদস, ঋগদ, সগপ, গপনি, ঋমদ। মাতৃকা—ঋগদনি, সগপনি, সঋমদ।

দেখা যাবে যে তিনটি মাতৃকার ভিত্তিতে বিভিন্ন মাতৃকার বা বিভিন্ন সুরের রূপ নিয়েছে। শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর বইখানিতে এই তিনটি মাতৃকার ভিত্তিতে বিভিন্ন রূপের সন্ধান দিয়েছেন। সেই ভিত্তিতে ২৭ নম্বর গানখানিকে বলা যায় পরজ-কালেংড়া। ২৬ সংখ্যক গানখানির মধ্যে সঋমদ ও সগপনি এই দুটি মাতৃকার প্রাধান্য সমান হয়ে রয়েছে। এই ধরণের বৈশিষ্টকে অমিয় বাবু এক জায়গায় বলেছেন সুর বঙ্গালী-ভৈঁরো। অবশ্য গানখানিতে রামকেলীর প্রাধান্য ফুটে উঠেছে যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে আর একখানি গানের উল্লেখ করবো। গানখানি হল "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে"। গানখানিকে শান্তিদেব বাবু রামকেলী বলে উল্লেখ করেছেন। এই গানখানির প্রধান খন্ডমেরু গপনি, দ্বিতীয় গদনি। মাতৃকার ক্রম হল,—সগপনি, ঋগদনি, সঋমদ। গান দুটিরই ছক তিনটি মাতৃকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গঠন প্রকৃতি আলাদা। শেষোক্ত গানখানির মধ্যে শুদ্ধ নিখাবের প্রাধান্য এত বেশী না থাকলে যথার্থ রামকেলী হয়ত হতে পারতো। আসলে গানখানির মধ্যে প ও নি অধিক লাগানোর ফলে শুদ্ধ রেখাবও প্রচ্ছন্নভাবে এসে পড়েছে। এই প্রচ্ছন্ন রেখাবের উপস্থিতি এতই প্রবল যে এর ফলে পনির, পণির ও ণিরম এই তিনটি নূতন খন্ডমেরু ও পণিরম এই নূতন মাতৃকাটি সুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। এইখানেই সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট বোঝা যায়। রামকেলী ও ভৈঁরো সুরও যেন রবীন্দ্র-নাথের প্রাণে "নব নব রূপে" দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে কিন্তু ২৬ সংখ্যক গানটিকে রামকেলী বলে স্বীকার করে নিলে শেষোক্ত গানটিকে একই পর্যায়ে ফেলা যাবেনা। আমরা এই তিন মাতৃকার ভিত্তিতে গঠিত আরও কয়েকটি গান এখানে তুলে দিচ্ছি,—২৮। একটুকু ছোঁয়া লাগে—প্রধান খন্ডমেরু মদস মাতৃকার ক্রম, সঋমদ, সগপনি, ঋগধনি। ২৯। আমার এ পথ—প্রধান খন্ড-মেরু মদস মাতৃকার ক্রম,—সঋমদ, ঋগদনি, সগপনি ৩০। ওগো বঁধু সুন্দরী—প্রধান খন্ডমেরু মদস মাতৃকার ক্রম,—সঋমদ, সগপনি, ঋগদনি ৩২। নিশীথ রাতের প্রাণ—প্রধান খন্ডমেরু মদস মাতৃকার ক্রম,—সঋমদ, সগপনি, ঋগদনি—এখানে কোমলণির ব্যবহারের ফলে ণরম খন্ডমেরুটি নূতন সৃষ্টি হয়েছে যেটি মদস খন্ডমেরুর পরই প্রাধান্য লাভ করেছে। ৩৩। যুগে যুগে বুঝি আমায়—প্রধান খন্ডমেরু মদস মাতৃকার ক্রম—সঋমদ, সগপনি, ঋগদনি। এখানেও ণরম খন্ডমেরুটি এসেছে যদিও দ্বিতীয় প্রবল খন্ডমেরু এখানে সগপ। ৩৪। আমার এ পথ—প্রধান খন্ডমেরু মদস মাতৃকার ক্রম সঋমদ, ঋগদনি, সগপনি। নূতন খন্ডমেরু ণিরম-র প্রাধান্য অল্প।

এই গানগুলিকে নামকরণ করতে হলে দেখা যাবে যে মোটামুটি দু'টি ভাগ এর মধ্যে আছে। প্রথম ২৯ ও ৩৪ এবং দ্বিতীয় হ'ল ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ সংখ্যক গানগুলি। আমাদের মতে প্রথম ভাগটি হল ভৈঁরো ও দ্বিতীয় ভাগটি রামকেলী। তবে রাগ বৈশিষ্ট্য মাত্র ২৮ ও ৩১ সংখ্যক গানে প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্য গানগুলিতে রাগের বৈশিষ্ট অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্য গানগুলিতে রাগের বৈশিষ্ট অপেক্ষা রসের বৈশিষ্টই বেশী। এগুলিকে

নাট্যসঙ্গীত বলা চলতে পারে।

আমরা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের নামকরণ করবার আগে এই সিদ্ধান্তগুলিকে মনে রাখতে হবে।

১। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্ত গানগুলিতে সুরের নাম দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। রাগ শক্তির প্রাধান্য বিচারের পরই নামকরণ যুক্তিযুক্ত।

২। হিন্দী ভাঙ্গা গানগুলি বাদ দিলেও অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত রাগসঙ্গীতের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এবং সেগুলিকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে।

৩। রবীন্দ্রনাথ সুরারোপ করবার সময় ভারতবর্ষের প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতকারদের পথই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত মন অনুভূতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল—সঙ্গীত পাণ্ডিত্যের আদর্শে নয়।

৪। সুরের মিশ্রণ সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে সঙ্গীতগুলিকে ভাল করে বিচার করবার প্রয়োজন আছে। অধিকাংশ গান, যেগুলি সুরের মিশ্রণে সৃষ্টি বলে অভিহিত করা হয় সেকথা সবসময় যথার্থ নয়।

৫। এ পর্যন্ত যত গানে সুরের নামকরণ করা হয়েছে সেগুলিকে পুনরায় বিচার করা দরকার এবং ভ্রমগুলিকে সংশোধন করা উচিত।

৬। রাগ সঙ্গীত শিল্পীর স্বাধীনতা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীর নেই বলে তার রাগ বিচারও প্রচলিত উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে করা উচিত হবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে আমরা বক্তব্য শেষ করবো। রবীন্দ্রনাথের গান শুধু সুর নয়। তার ভাষা, ছন্দ ও সর্বমিলিয়ে একটা নাটকীয়তা আছে। সুরের বিচার রবীন্দ্র সঙ্গীতে নিতান্তই আংশিক। রবীন্দ্র প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন নয়।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃী) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিনা-স্বাক্ষরে প্রথম কবিতা প্রকাশ[১] থেকে আরম্ভ করে ১৯৪১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে অকৃপণ ঔদার্যে রচনা প্রকাশ করে গিয়েছেন, এ কথা সর্বজনবিদিত; কোনো সাময়িক পত্রের সম্পাদক তাঁর কাছে রচনা প্রার্থনা করে নিরাশ হন নি, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এ সকল পত্রিকার কতকগুলি অচিরস্থায়ী, ওষধিজাতীয়; অনেকগুলি সমসাময়িককালে খ্যাতিলাভ করে এখন লুপ্ত বা বিস্মৃতপ্রায় হলেও বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণযোগ্য।

এ কথা অনেকেই জানেন যে, এই রচনার অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। বিভিন্ন সময়ে এগুলি সংগ্রহের আয়োজন হয় ও এইরূপ 'অপ্রকাশিত' রচনা সংবলিত হয়ে কতকগুলি গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রকাশের সময় থেকে এগুলি সংগ্রহ ও গ্রন্থভুক্ত করার পুনরায় উদযোগ হয়, তার ফলে এরূপ অনেক রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'সংযোজন'-বিভাগে স্থান পেয়েছে; এই জাতীয় রচনা অবলম্বনে অনেকগুলি নূতন গ্রন্থও রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকগুলি রচনা পূর্বপ্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থেও বিষয়ানুসারে সংযোজিত হয়েছে। এইরূপ আরো কতকগুলি গ্রন্থ বর্তমানে যন্ত্রস্থ।

এই কাজ যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করবার জন্য গ্রন্থাকারে সংকলন সমাপ্ত হবার পূর্বে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সহায়তার জন্যও, সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্ররচনার তালিকা প্রকাশের আবশ্যকতা।

এইরূপ তালিকায় ত্রুটি থেকে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা—পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, যদি কেউ কোনো ভ্রম লক্ষ করেন তবে তা যেন অনুগ্রহপূর্বক সংকলয়িতাদের গোচরীভূত করেন। এই তালিকায় রচনার নামের পরে, রচনাটি রবীন্দ্রনাথের যে-গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। যদি গ্রন্থভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে 'অপ্রকাশিত' বলে তা নির্দেশ করা হয়েছে। গানগুলি সবই গীতবিতান-ভুক্ত, এক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হল না।

এই সংখ্যায় 'বঙ্গবাণী' পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার সূচী মুদ্রিত হল। বঙ্গবাণী মাসিক পত্র ১৩২৮ সনের ফাল্গুনে প্রথম প্রকাশিত হয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদকতায়। পত্রিকাটি ছয় বৎসর চলেছিল।

বঙ্গবাণী

প্রথম বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩২৮—মাঘ ১৩২৯

॥ ফাল্গুন ১৩২৮ ॥

বাণী-বিনিময়

কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি

শিশু ভোলানাথ
॥ বৈশাখ ১৩২৯ ॥
পরীর পরিচয়
লিপিকা
দ্বি তী য় ব র্ষ ॥ ফা ল্গু ন ১ ৩ ২ ৯—মা ঘ ১ ৩ ৩ ০
॥ ফাল্গুন ১৩২৯ ॥
সমবায়
সমবায়নীতি, "সমবায় ২"
॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ॥
গান
'তোমার বীণায় গান ছিল'
॥ শ্রাবণ ১৩৩০ ॥
একখানি চিঠি
পূরবী, "শিলঙের চিঠি"
॥ কার্ত্তিক ১৩৩০ ॥
যাত্রা
পূরবী
তৃ তী য় ব র্ষ ॥ ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ০—মা ঘ ১ ৩ ৩ ১
॥ চৈত্র ১৩৩০ ॥
ভাঙা মন্দির
পূরবী
॥ বৈশাখ ১৩৩১ ॥
গানের সাজি এনেছি আজি
"পূরবী, "গানের সাজি"
সাহিত্য
সাহিত্যের পথে
॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ॥
ম্যালেরিয়া
২৩।২।২৪ তারিখে এ্যান্টিম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৪র্থ বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা
অপ্রকাশিত
রেঙ্গুনে বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনীতে কবি সম্বর্ধনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ
অপ্রকাশিত
॥ ভাদ্র ১৩৩১ ॥
তথ্য ও সত্য
সাহিত্যের পথে

---

১. রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'

সৃষ্টি
॥ কার্ত্তিক ১৩৩১ ॥
সাহিত্যের পথে
চ তু র্থ ব র্ষ, ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ১ — মা ঘ ১ ৩ ৩ ২
॥ চৈত্র ১৩৩১ ॥
বাতাস
পূরবী
॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ॥
পদধ্বনি
পূরবী
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সঙ্গীত
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'কথোপকথন'। "কবিবর তাঁর নিজের বক্তব্যটুকু প্রায় সমস্তটাই আদ্যন্ত লিখে দিয়েছেন।"
অপ্রকাশিত
ষ ষ্ঠ ব র্ষ ॥ ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ৩ — মা ঘ ১ ৩ ৩ ৪
॥ ফাল্গুন ১৩৩১ ॥
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত।
১. অদ্য রাত্রি সাড়ে সাত। ৪ শ্রাবণ ১৩০৪।
২. নববর্ষের প্রিয় সম্ভাষণ জানিবেন। ৭ বৈশাখ ১৩১২।
৩. আমাদের স্কুলে দুটি মাত্র। ১৪ বৈশাখ ১৩১২।
৪. আপনার চিঠি পড়িয়া যাহা। ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২।
অপ্রকাশিত
মাঘ ১৩৩২
ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ
মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।
অপ্রকাশিত
॥ চৈত্র ১৩৩৩ ॥
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-কে লিখিত
৫. শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠি পাঠাইতেছি। ১৯ বৈশাখ ১৩১৪।
৬. শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন। ৪ জ্যৈষ্ঠ১৩১৪।
৭. শাস্ত্রীমহাশয়ের পত্রাংশ। ১১ আষাঢ় ১৩১৪।
৮. শাস্ত্রীমহাশয় শতপথ সূত্র। ১৭ আষাঢ় ১৩১৪।
৯. শাস্ত্রীমহাশয়ের পত্র পড়িয়া। ১৩ শ্রাবণ ১৩১৪।
১০. হঠাৎ কন্যার পাঁড়ার সংবাদে। পোস্টমার্ক—৩ আগস্ট ১৯০৭
১১. শাস্ত্রীমহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণের। ২৬ পৌষ ১৩১৪।
১২. আপনি ত বাসা বদল করিয়া। ১১ ফাল্গুন ১৩১৪।
অপ্রকাশিত
॥ বৈশাখ ১৩৩৪ ॥
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-কে লিখিত

*১৩. এখানে আসিয়া অবধি। ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৫।
১৪. বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া। ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫।
১৫. যাহা বলিয়াছিলাম। ১ পৌষ ১৩১৫।
১৬. শব্দতত্ত্ব এবং অন্য গদ্যগ্রন্থগুলি। ২৬ বৈশাখ ১৩১৬।
১৭. চিঠিখানা পড়িয়া যাহা। ৩০ আষাঢ় ১৩১৬।
১৮. বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে। পোস্টমার্ক—১৭.৯. '০৯।
১৯. লালগোলার রাজাবাহাদুর। ২৭ আশ্বিন ১৩১৬।
অপ্রকাশিত

॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ ॥

সম্মান

চন্দননগর পৌরসভায় অভ্যর্থনা উপলক্ষে কথিত। ২১ বৈশাখ ১৩৩৪।
অপ্রকাশিত
বিশ্বভারতী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত, চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

॥ আষাঢ় ১৩৩৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-কে লিখিত
২০. পাব্‌লিকের সেবাকার্য হতে। "তারিখ ঠিক জানা নেই।"
২১. এতদিন চিনির কারখানা। ৩২ ভাদ্র ১৩১৭।
২২. আমাদের দেশে জন্মলাভকে। ২১ বৈশাখ ১৩১৮।
২৩. একখানি পত্র এইসঙ্গে পাঠাইলাম। ২২ বৈশাখ ১৩১৮।
২৪. আমার পুরাতন চিঠিপত্রের। ১৭ ফাল্গুন ১৩১৮।
২৫. সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে। ১ অগ্রহায়ণ ১৩২০।
২৬. কোনো ঠিকানা না রাখিয়া। ১২ পৌষ ১৩২১।
২৭. আপনার স্নিগ্ধ পত্রখানি পাইয়া। ২৭ পৌষ ১৩২১।
২৪ সংখ্যক চিঠি ছিন্নপত্র ১৩৬৫ সংস্করণের পরিশেষে উদ্ধৃত। অপরগুলি
অপ্রকাশিত

॥ মাঘ ১৩৩৪ ॥

'সাহিত্য-ধর্ম'-এর জের

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পত্রের উত্তরে কবির পত্র। ১৩ অগ্রহায়ণ [১৩৩৪ ?]
"সামাজিক প্রবন্ধে আপনার সাহসিকতা দেখিয়া।"
অপ্রকাশিত

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

* ত্রিবেদী মহাশয়কে লিখিত নহে। তাঁর পত্র-সংগ্রহের সংলগ্ন ছিল

স মা লো চ না

ভারত পথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। মূল্য ৩, খৃষ্ট ।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী।

নিজের জীবন কাহিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ছিল যে ঘটনার তালিকায় মানুষ চাপা পড়ে। তার ভিতরকার শক্তি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তার বাইরের কৃতকর্ম তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অন্যের জীবন আলোচনার ক্ষেত্রে কবির ভুল হয়নি। ইতিপূর্বে আমরা বিদ্যাসাগর চরিতে দেখেছি আবার নতুন করে ভারতপথিক রামমোহন রায় ও খৃষ্টে দেখলুম যে ঘটনা নয় মহৎ প্রতিভার আন্তরিক শক্তির রূপই তিনি উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিভার শক্তি কৃতকর্মের গৌরবদীপ্তি ভেদ করে তাঁদেরই চোখে ধরা পড়ে যাঁরা নিজেদের জীবনে সেই শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। তাই রামমোহন ও খৃষ্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ থেকে তাঁর গ্রন্থ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

রামমোহন সম্বন্ধে অধিকাংশ গ্রন্থই তাঁর প্রতিভার ফল অর্থাৎ তাঁর কৃতকর্মের বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ সে আলোচনায় হানিনি, তিনি প্রতিভার স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলির তুলনা করলে মনে হয় যে কবির ভাবের দৃষ্টিতে না দেখলে রামমোহন জাতীয় লোককে শুধু কর্মী পুরুষ বলেই মনে হবে। তাঁদের ধ্যান ও ধারণার যে সমুন্নত রূপ জাতিকে পরিচালিত করে তারই কথা রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন সময়ের প্রবন্ধে বলেছেন।

আমাদের দেশের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে রামমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা পড়ানো হয়। তাতে তাঁর প্রধান প্রধান কর্মের উল্লেখ থাকে। ফলে তাঁর নাম স্কুল কলেজে পড়া কারো কাছেই অপরিচিত নয়। কিন্তু ঐটুকুই —তারপর থেকে রামমোহনের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বইয়ের পাতায় নির্বাসিত—তিনি বর্তমান বাঙ্গালীর মনের নৈকট্য লাভ করতে পারেন নি। মুষ্টিমেয় কিছু লোক তাঁর জীবনী পড়ে, আরও অল্প লোক তাঁর নিজের রচনা পড়ে।

বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যে ঋজু মুক্ত বিচারবুদ্ধি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বকে পরিচালিত করতো, তার সঙ্গে বাঙ্গালীর মনের মিল নেই। ভাবের স্রোতে যে লোক ভাসতে পারেনি, যে লোক বিচার করেছে, প্রজ্ঞার উজ্জ্বল আলোকে সংস্কারের অন্ধকার দূর করেছে তার চেয়ে আবেগ উন্মত্ত, ভাবরসের পথিককে বাঙ্গালী অনেক বেশী আপনার লোক বলে মনে করেছে। তাদের অবতার বানিয়েছে, দেবতা বানিয়েছে ভগবানের বিগ্রহ বানিয়েছে তবে মন খুসী হয়েছে। রামমোহন তাই আজও শিক্ষিত বাঙ্গালীর একাংশের চিন্তানায়ক, সমগ্র জাতির মনের মানুষ তিনি নন। বলাবাহুল্য যাঁরা এ সম্বন্ধে খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে রামমোহন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোন কাজ করেন নি। সুতরাং জনচিত্তের ভাবোন্মত্ততার স্রোত তাকে ঘিরে বইতে পায় নি। জনপ্রিয়তার প্রসার ও আয়তনে যাদের সুনাম ও মহত্বের খ্যাতি নির্ভর করে রামমোহন তাঁদের দলে নন। রবীন্দ্রনাথ সেই আত্মবিস্মৃত, বিরাট প্রতিভার রূপ আমাদের কাছে ধরেছেন। বাইশবছর বয়স থেকে আশী বছর

পর্যন্ত, নানা রচনায় নানা ভাষণে তিনি রামমোহনের বিচার করেছেন, তাঁর মহত্বকে স্বীকার করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সেই সমস্ত রচনা সংকলিত করে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'ভারতপথিক রামমোহন' প্রকাশ করেছেন।

ভারতবর্ষের ধর্মের চিরন্তন সাধনা বিরোধের সমন্বয়সাধন। ইতিহাসের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে একেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাসের সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগীয় সাধকেরা যাঁরা অনেকেই 'অবিম্বান অন্ত্যজজাতীয় ছিলেন তাঁরা ঐক্যসাধনের চেষ্টা করেছিলেন। সেই সাধনার নতুন সাধক রামমোহন। ভারতবর্ষের ঐক্য পন্থাকে সন্ধান করেছেন বলে তিনি 'ভারতপথিক' কোন ভৌগোলিক সংকীর্ণতা, কোন ধর্মগত, জাতিগত, দেশগত সংকীর্ণতা তাঁর মহৎ মানবত্বকে স্পর্শ করতে পারেনি—"রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানবলোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য।"

এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে দিতে লোভ হচ্ছে—সে লোভ সংবরণ করতে হলো। ঘরে ঘরে এ গ্রন্থের সমাদর হোক একথা বলা নিরর্থক। কারণ তা হবে না। এ গ্রন্থ চিন্তাকে জাগ্রত করে সেই জাগ্রত চিন্তা গভীর উপলব্ধির আনন্দ লোকে পৌঁছে দেয়। চিন্তা সাপেক্ষ আনন্দ উপলব্ধির পথ গ্রহণ করার লোক অল্প। আবার আরেকদল আছেন যাঁরা রামমোহনকেও দেবতা বানিয়েছেন। অন্যগুরুদের পাল্টা হিসাবে রামমোহনকে খাড়া করে তাঁকে ছোট করেছেন। দুর্বুদ্ধি শত্রু আর নির্বোধ মিত্রেরা রামমোহনকে সাম্প্রদায়িক গুরু বানাবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের ঘোলাটে অপপ্রচারের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সদিচ্ছাসম্পন্ন বুদ্ধিবাদী হৃদয়বান লোকেদের শ্রেষ্ঠতম সহায় 'ভারত পথিক রামমোহন'।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তির আর একটি গ্রন্থ খৃষ্ট। আর এক নিত্যকালের মহামানবের প্রতি কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি। এটিতে আছে দুটি অভিভাষণ, তিনটি কবিতা, বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে বারোটি খৃষ্টসম্বন্ধীয় অংশের সংকলন। আধুনিক কালের য়ুরোপে বহু চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা খৃষ্টান ধর্মের বর্তমান পরিণতি দেখে লজ্জা বোধ করেন। তাঁরা জানেন যে হিংসার এই উন্মত্ততা খৃষ্টানের ধর্ম নয়, বঞ্চনা প্রতারণা খৃষ্টানের ধর্ম নয়। তাঁরা আধুনিক বিকৃতির জঞ্জাল-স্তূপের আবরণ সরিয়ে খৃষ্টের মহত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা গেছে।

মানবপ্রেম ও ত্যাগের যে বার্তা খৃষ্টানধর্মের মূল মন্ত্র সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আশ্রয় পেয়েছে। তাই খৃষ্টকে তিনি নিত্যকালের একজন শ্রেষ্ঠ মানব বলতে দ্বিধা করেন নি। যাঁরা খৃষ্টকে শুধু একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন না, তাঁরা খৃষ্টের মহৎ মানবত্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে এই গ্রন্থ অবশ্যই পড়বেন। কবির একটি পাণ্ডুলিপি অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের দুটি চিত্র এ গ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ।

মঞ্জুলা বসু

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

জাতীয় উৎসব

মা বলেন কোলকাতার লোকগুলোর কি কোন কাজকর্ম নেই যে নিত্যিই উচ্ছব চালাচ্ছে? পথে বেরুন ব্যানার আর পোস্টারে অবিচ্ছিন্ন উৎসবের ঘোষণা : নাট্য-উৎসব, যুবউৎসব, অজস্র সংস্কৃতি সম্মেলন; রবীন্দ্র-উৎসব, ইপটা উৎসব, নৃত্য-উৎসব; সঙ্গীত সম্মেলন; বিশ্বনারী উৎসব নাট্যসাহিত্য সম্মেলন, একই সঙ্গে এই কলকাতার বুকে একাধিক উৎসব চলছে বারমাস।

অথচ যতই সাংস্কৃতিক মার্কা দেওয়া হোকনা এগুলোকে, সংস্কৃতির মূল লক্ষণটিই এগুলির অধিকাংশে অনুপস্থিত। ঐতিহ্যসম্মত বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জীবনপদ্ধতিই হল সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি, অবশ্য যুগের প্রয়োজনমত যদি তার মধ্যে পরিবর্তন প্রয়োগ না করা যায়, তবে সংস্কৃতির 'ধারা' যায় থেমে, জীবনে পচন ধরে যেমনটি ঘটেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আগের যুগের বাংলায়।

আজকে বারমাসের অবিচ্ছিন্ন উৎসব তার অধিকাংশের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারেনা। এখানে ওখানে অমুক বাবার মেলা, এখানে অমুকঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব, সেখানে অমুক-স্বামীর তিরোধান উৎসব এগুলি কোনদিনই জাতীয় উৎসব বলে পরিগণিত হয়নি, অধিকাংশ মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগদিলেই সে উৎসব জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে উঠতে পারে। আজকের দিনে, অন্তত মধ্যবিত্তসমাজে এত সব নিত্যউৎসবের প্রভাব এমন বেড়েছে যে আনুষ্ঠানিক উৎসব সম্পর্কে আর আমরা তেমন আগ্রহ বোধ করিনা।

করিনা তার কারণ, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ ছিল ইয়োরোপীয়। যাঁরা আই সি এস, যাঁরা ব্যারিষ্টার বা ঐ জাতীয় সমাজের একেবারে উপরতলার আজ তাঁরা তাদের জীবনে ইয়োরোপীয় ধারা প্রায় পুরোপুরি প্রবর্তন করেছিলেন। আর আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ ইংরেজী শিক্ষা ও সিনেমামারফত ইয়োরামেরিকার জীবন যাত্রা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ইয়োরোপীয় জীবনের উৎসবগুলি সম্পর্কে কাঙ্গালিপনা বোধ করতে লাগলাম। ৩১শে ডিসেম্বরে মধ্যরাত্রে নিউইয়ার্স ডে সেলিব্রেশান করবার জন্য চৌরঙ্গীপাড়ায় খাঁটি বিলেতে নকলে যে হুল্লোড় করেছি মাত্র পঁচিশ বছর আগে, তা ভাবতেও আজ হাসি আসে।

নিউইয়ার্স ডে বা ক্রীসমাস প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ব্যাপক উৎসবগুলি স্বাধীনতার স্রোতে ভেসে গেছে, কিন্তু ইয়োরোপীয় জীবনের সামাজিক উৎসবগুলি আমরা একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল জন্মদিনের উৎসব। জন্মদিন অনুষ্ঠান ব্যবস্থা আমাদের প্রাচীনপদ্ধতিতেও ছিল। কিন্তু চান্দ্রমাসের হিসেবে আমাদের ক্রিয়াকর্ম চলতো সেই জন্য আমাদের ব্যবস্থা ছিল জন্মতিথির পুজো। বর্তমানে আমরা যে জন্মদিনের উৎসব করি সেটা আসলে বার্থ ডে সেলিব্রেশান, যেটা নিয়ে চিন্তাশীল ইংরেজরাও ঠাট্টা করে বলেন : আত্মীয় বন্ধুর কাছ থেকে বাৎসরিক উপহার আদায়ের ফিকির মাত্র। তা হোক তাতে ক্ষতি ছিলনা, কিন্তু যখন দেখি জন্মতিথির পুজোর বদলে আমরাও কেক কাটছি এবং মোমবাতি জ্বালাতে সুরু করেছি তখন সত্যি হাসি আসে। এখনি কেউ তেড়ে আসবেন, বলবেন পুজোর

কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। হয়তো হবে। তবে ইয়োরোপে চূড়ান্ত বিজ্ঞানপন্থীরাও সামাজিক পদ্ধতিতে গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করেন, তার বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন না, কিন্তু আমরা গতানুগতিক জাতীয় রীতি অবৈজ্ঞানিক রীতি বিসর্জন দিয়ে ওদের সমান অবৈজ্ঞানিক রীতি গ্রহণ করে চলেছি। সে যুগে সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে অতি সাহেবিয়ানা বেমানান ঠেকতো, আজ স্বাধীনভারতে মধ্যবিত্ত তার পদোন্নতির মোহে এমনই মশগুল যে, সে যুগে ব্যারিষ্টার আই-সি-এসরা যা করতো আজ নিম্নমধ্যবিত্তরা নির্বিবাদে তাই করে চলেছে। তখন সামান্য কেরানীগিরি করি তবু বাড়ীতে পাজামার উপর কিওমোনো চরিয়ে বেড়াই। পিতৃদেব একদিন বলেছিলেন ভাগ্যদোষে যখন ডেপুটি হতে পারিস নি, তখন ডেপুটিগিরির সাজটা বড্ড বেমানান লাগেনাকি। তখন হয়তো অনেকের চোখে লেগেছে। কিন্তু আজ আর লাগেনা। আজ সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজই লর্ডস স্টাইলে চলতে চায়। স্বাধীন ভারতেই এইটাই সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। কেন যে আজও মধ্যবিত্তরা বাড়ী করার সময়ে সেকেলে ব্যারিস্টার আই সি এস-দের নকলে ফায়ারপ্লেস তৈরী করছে এইটেই আমার কাছে রহস্য লাগে। তবু যে ইয়োরোপীয় উৎসব আমরা বেশী গ্রহণ করতে পারিনি তার কারণ তাদের জীবনে আনুষ্ঠানিক উৎসবের সংখ্যা খুবই কম। তাদের জীবনে নিত্য উৎসব, সুবিধা হলে রোজই চা-পার্টি। আমাদের জীবনেও সেই চা-পার্টির বাহুল্য এসেছে, জাতীয় উৎসব গেছে মিলিয়ে।

দক্ষিণ কলকাতায় একজনের ড্রয়িংরুমে বসে চা-কেন্দ্রিক আড্ডা চলছিল, বাইরে কিসের বাজনা বাজছিল জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক, তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হল সেদিন সরস্বতী পুজোর ভাসান। সরস্বতী পুজোর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সম্পর্ক হল চাঁদা দিয়ে এবং মাইকের আওয়াজ শুনে বিরক্তি প্রকাশ করা। মাইকের অপব্যবহারে বিরক্তি হবারই কথা, কিন্তু উৎসবটা চ্যাংড়াদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরার যদি নিজেরা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা করি, তবে উৎসবে চ্যাংড়ামি ঢোকার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে লাভ কি।

এই সরস্বতী পুজো একদিকে জ্ঞান বিদ্যাও শিল্পসাধনার প্রতীক, আর সঙ্গে সঙ্গে তা নববসন্তের আবাহন। এমন একটি উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অথচ ইদানীং কালে পুজোর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে থাকলেও উৎসব প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। স্কুলেই বলুন আর ক্লাবেই বলুন আর অমুকবাজারের পিঁয়াজ বিক্রেতা সমিতির পুজোই বলুন সব প্রতিমা সাজানোর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য, প্রসাদ বিতরণ মাইকে সিনেমার গান বাজানো এবং পরদিন সন্ধ্যায় লরীতে ঠাকুর বসিয়ে ভাসানের ভিড়ে অচল অবস্থা সৃষ্টি করা। সব পুজো এক রুটিনে বাঁধা। অথচ জ্ঞানবিদ্যা শিল্প ও বসন্তের আবাহন উপলক্ষে কতবিচিত্রভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া যায়! বর্তমান কালে সারা বছরে নানা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা চলে, কিন্তু কটা সরস্বতী পুজার কার্যক্রমে আবৃত্তি প্রদর্শনী থাকে। কোথায় দেখেন নাচ গান অভিনয় নৃত্যের আয়োজন? ইদানীং যে একাঙ্কিকা নাটক আন্দোলন চলছে, যদি সরস্বতী পুজো উপলক্ষে অজস্র একাঙ্কিকা অভিনীত হয় তবে এই আন্দোলনের সার্থকতা কি, একাঙ্কিকা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জিনিষ নয়, ঘরোয়া পরিবেশে নাটক অভিনয়ের সুযোগ, সেই সুযোগ গ্রহণের আদর্শ উপলক্ষ কি সরস্বতী পুজো নয়? গান বাজনার আসর আজ আর সরস্বতী পুজোয় বসেনা, আজ কারণে অকারণে নব নব জাতীয় সঙ্গীত বাজে এ যুগের তানসেনদের কন্ঠের যান্ত্রিক রূপায়নে। এবারকার সরস্বতীপুজোয় নিশ্চয় সর্বত্র শুনবো উত্তমকুমারের ব-কন্ঠে হেমন্তকুমার গীত পায়রা ওড়ানোর গান।

আসলে উৎসবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অবহিতি হারিয়ে ফেলেছি। পুজোটা নেহাৎ পাঁজির রুটিন

করা, আর চাঁদা দেওয়া এড়াতে পারবোনা বলে দেওয়া।

আমার যৌবনে যখন পর্যন্ত সরস্বতীপুজো উৎসব ছিল। তখন ক্রিকেট খেলতে জানার মত গুরুতর অপরাধের শাস্তি ছিল সরস্বতীর পুজার উৎসব থেকে বঞ্চিত হওয়া। কার্তিক বসু যেদিন ইডেন গার্ডেনে সেঞ্চুরী করলেন আমার ভাগ্যে তা দেখা হলনা, কারণ সেদিন ছিল সরস্বতী পুজো। মনে মনে রাগ হয়েছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের ইংরেজ দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় ক্রিকেট ব্যবস্থায় : আমরা অধীন জাতি বলেই কি আমাদের ছাত্র ও তরুণদের সরস্বতীপুজোয় বঞ্চিত করে ক্রিকেট খেলতে ধরে নিয়ে যেতে হবে? অথচ আজ বাঙালী পরিচালিত ক্রিকেট ব্যবস্থায়ও সরস্বতী পুজার দিনটির ইজ্জৎ একটুও বাড়েনি।

যান্ত্রিক জীবনে উৎসবের মধ্যেও যন্ত্রের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে উৎসবের রেশটুকু হারিয়ে গেছে। এক এক সময়ে মনে হয় বিজয়ার দিন কিংবা দেওয়ালীর দিনের সন্ধ্যায় অবকাশটুকুরও বুঝি একটিমাত্র উদ্দেশ্য, সিনেমা দেখা। অথচ গতানুগতিক নিত্যকার জীবনের রুটিন থেকে যে ব্যতিক্রম ও বৈচিত্র্য যার মধ্যে আমার আমিকে আমি খুজে পেতে পারি, অন্তত খুজবার প্রয়াসটি করতে পারি, তাতেই তো উৎসবের সার্থকতা। যে রুটিন থেকে পালানোয় উৎসবের মাধুর্য, সে রুটিন সব সময় কাজের রুটিন নাও হতে পারে, ক্রিকেট খেলার রুটিন, সিনেমা দেখার রুটিন, কোন বিশেষ আড্ডায় নিয়মিত মিলিত হয়ে একটি বিশেষ ধরণের কর্মধারার রুটিন,-এই সব রুটিনও কম পীড়াদায়ক নয়, মন এতেও হাঁপিয়ে ওঠে, যাদের ওঠেনা, মন তাদের নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে।

বাঙলার জাতীয় উৎসব কটি? বর্ষশেষ বা চড়ক এবং নববর্ষে, ষষ্ঠীপুজা, দুর্গোৎসব ও লক্ষ্মীপুজা, কালীপুজাও দেওয়ালী, ভাইফোঁটা, সরস্বতীপুজাও দোল।

নববর্ষ আজ শুভ নতুনখাতা মহরতে পরিণত হয়েছে। চড়কের মেলা বর্তমানে ইন্ডাশ্ট্রিজ ফেয়ার-এর যুগে অচল। সন্তানের কল্যাণে যে উৎসব, আজ ছেলের বাপ বেয়াইদের দাপটে শাসিত কলকাতার সমাজ তার আসল রূপটি বাতিল করে আগাছাটিকে প্রধান্য দিয়েছে, সন্তানের সামিল বলেই ষষ্ঠীপুজার দিন জামাইও উৎসবে আমন্ত্রিত হত, তাকে বাড়ীর অন্যান্য সন্তানেরই মত আশীর্বাদী উপহার দেওয়া হত কল্যাণ কামনায়। আজ ঘরের ছেলে তলিয়ে গেছে, ষষ্ঠী হয়ে বসেছেন জামাইষষ্ঠী নিছক একটা লেনদেনের পালা, যদিও পাঁজি স্পষ্ট উল্লেখ করতে ভোলেনা আচারৎ জামাতুরর্চনম্।

এই আচারটি সৃষ্টি করেছিলেন কারা? নিশ্চয়ই কলকাতার প্রথমযুগের সমাজনেতা বেনিয়ান মুৎছুদ্দিরা, তারপর এটর্ণি-উকিল সমাজের নেতৃত্বের যুগ পার হয়ে বর্তমান যুগে তার পুরাণো আসলরূপটি বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে।

এইভাবে আর একটি ভয়াবহ রূপান্তর ঘটছে বাঙ্গালীজীবনের মধুরতম, উৎসব ভাইফোটায়। এমন একটি ভাইবোনের মিলনের বার্ষিক দিনটিকে কোন দিন বাঙ্গলা সরকার ছুটির দিন বলে গণ্য করেনি। অথচ বেনিয়ানচলিত সমাজে জগদ্ধাত্রীপুজোর ছুটি ছিল দুদিন, যে জগদ্ধাত্রীপুজোর সংখ্যা তখনকার কলকাতাতে ছিল মুষ্টিমেয়। ভাইফোঁটা প্রতি ঘরের উৎসব, এই ভাইবোনের মিলনটুকতে অনেক বাধা। এখানে একবোন, ওখানে একবোন। সে মিলন কি সকালে আফিস যাবার আগে কিংবা আফিস ফেরৎ ছুটোছুটি করে সারা যায়। স্বাধীন বাঙ্গলায় এত ছুটির ওলটপালট হল, অথচ এমন একটি সার্বজনীন স্নিগ্ধমধুর উৎসবের দিনটি ছুটি ঘোষণা করার কথা কেউ ভাবল না।

ভাবলে না কেন? এও সেই ছেলের বাপ বেয়াইদের প্রভাব। বৈবাহিক সম্পর্কে বরের পক্ষ এক-তরফা আদায় করে যাবে; এর মধ্যে কনের ভাই-এর বরপক্ষ থেকে পাওয়ার একটামাত্র সুযোগও বরপক্ষ

সহ্য করতে রাজী নয়, কাজেই উৎসবটিকে গোড়াথেকেই পশ্চাৎ করে রাখা হয়েছে দিনটিতে ছুটির বন্দোবস্ত না করে। তার অনিবার্য ফল যা হয়েছে তা হল, বোন আর এখন ভাইকে নিমন্ত্রণ করে না, কারণ ভাইএর পক্ষে যাবার অসুবিধা। তাই বোন মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে ভাইয়েদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াই। ভাইটিকে সযত্নে রেখে আদর করে পরিবেশন করে খাওয়ানো বাতিল হয়ে গেছে। তাছাড়া দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে বড়পক্ষেরই যাতে শেষ পর্যন্ত লাভ থাকে, তার জন্য বোন ভাইকে কাপড় দেওয়ার পুরাতন প্রথার সঙ্গে নতুন প্রথা চালু করে দেওয়া হয়েছে, ভাইও বোনকে শাড়ী দেবে। ধুতির দামের সর্বোচ্চ সীমা আছে, শাড়ীর দামের নেই।

দোল উৎসবটি হল শুধু পলাশের নেশা কিছু বা চাঁপায় মেশা। যে সমাজে মেয়ে ও পুরুষে সহজ মেলামেশা নেই সেখানে এই হুল্লোড়ের সুযোগটা নোংরামির খাতে বইবার আশঙ্কা যথেষ্ট। তাই দোল হয়ে উঠ্‌লো পথের উৎসব। সত্য বলতে কি শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে রাত্রে রেলগুনের পথে খুনখারাবির থা-থম-থম করা বর্ণনাটি পড়বার সময় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সেযুগে দোলের দিনে কলকাতার পথের চিত্র। বেশ চলেছি, কোন গলির ভেতর থেকে শাঁ করে ছুটে এল পিচকিরি-নিঃসৃত খুনখারাবি রঙ, প্রতিটি মোড়ে মোড়ে বিপদ। রুক্ষ হল নর্দমার কাদা, গরুর গাড়ীর চাকার কালি। অ্যালুমিনিয়াম বা ব্রোঞ্জ পাউডার, তেল আবির এর প্রসার এলো আরো পরে।

পথের উৎসব যখন নোংরা হুল্লোড়ে পরিণত হত, তখন বাড়িতে তার প্রবেশের পথ হল রুদ্ধ। বাড়ীর ভিতর দোলের উৎসবে যে যুগের রাহ্ম শুচিতা পরিব্যাপ্ত হল। যাও বা আত্মীয় বন্ধু মহলে কিছু যাওয়াআসা, রঙ-আবির খেলা চলতো ঐ দিনটিতে তাও রুদ্ধ হল,যখন সরকার সেদিনের মত ট্রাম বাস ট্যাক্সি বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করলে। না করেও উপায় ছিলনা। যেহেতু দক্ষিণ কলকাতার মেয়েরা পথবেয়ে পায়ে হেঁটে এবাড়ী ওবাড়ী যাওয়া-আসা করতো, তাই নারীবিবর্জিত পথের পাড়া থেকে দলে দলে দোলের দিন ভিড় করতে এল দক্ষিণ কলকাতায় এবং টেনিসিল দিয়ে দেখতেই তাদের উৎসুকা সাঁমাবদ্ধ থাকলো না।

আসলে দোল-উৎসবের সামাজিক দিকটা হারিয়ে যাওয়ার ফলেই তার মধ্যে অসামাজিকতার প্রসার বৃদ্ধি পেল। আগের যুগের দোলউৎসবের স্মৃতি আজ ক্ষণবাসন্তিকার মতই শুন্যে মিলিয়ে গেছে। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম কেমন করে আবিরভরা বারকোষের উপর নাচ চলতো, লাল ধুলোয় আঁধার হয়ে যেত সারাঘর, তারপর নাচ থামার পর দেখা গেল আসরের সবাই লালে লাল হয়ে গেছেন। এ যুগেও এমনটি হয়না তা নয়, জেষ্ঠ কনিষ্ঠ হিসাবে পায়ে আবির দিয়ে যার সুরু সমবেত নাচে গানে এবং আবির ছোড়াছুড়িতে তার ক্লাইম্যাক্স এমন একটি অনুষ্ঠানে এবারই যোগ দিয়েছি। তবু আজকের দিনে তা ব্যতিক্রম। গলদ যা ঘটেছে তা হল, আমাদেরই যৌবনে যা দেখেছি, নিগারদের ডার্টি বারবারাস ফেশিওভ্যালটিকে ভদ্রসমাজ থেকে দূরে করে দিয়েছিলাম সে যুগের রাহ্মরুচি প্রভাবিত মন নিয়ে। ফলে ঘরে বা আসরে জায়গা না পেয়ে দোল উৎসব পথে বেরিয়ে পড়লো, ছিন্ন বাধা পলাতক বালক নয়, বাপ তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলে, কুসংসর্গে পড়ে গুন্ডা বনে গেল এমনভাবে যে সমাজ তাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলে।

এই দোল উৎসব যদি সত্যিকার বাসন্তী মনোভাব নিয়ে সুস্থভাবে অনুষ্ঠান করা যায়, রুচিশীল সুস্থ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি দের সমবেত প্রচেষ্টায়, তাহলে আমাদের কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত জীবনে স্বারে জাগ্রত বসন্তকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে হবেনা।

বাঙলার সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা, একাধারে পূজা ও উৎসব। বর্তমানে এই উৎসব জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পূজার আসল বস্তু দাঁড়িয়েছে ছুটি এবং সেই ছুটি উপলক্ষ্যে যে যতদূর পার পাড়ি দাও। আগের যুগে এই উপলক্ষ্যে বিচ্ছিন্ন পরিবার বাড়ী এসে মিলিত হত। এখন দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ও খন্ডিখন্ডিত বাঙলায় বাড়ী ঘরের পাট উঠে গেছে। এখন স্পুটনিকের যুগে স্পুটনিকের বা লুনিকের মত আমরা স্বীয় কক্ষে শুন্যে ঘূর্ণমান। বাড়ী বলতে ফ্ল্যাট, পরিবার বলতে আড়াই জন, দেশঘর সবদেশে। কাজেই যেখানে মাটি গেছে হারিয়ে সেখানে মায়া থাকবে কোথা থেকে! অপরিবারিত মধ্যবিত্ত তরুণদের পূজোর বোনাস নিয়ে কাশ্মীর, উটি, কন্যাকুমারিকা ছোটার নেশা কেউ ঠেকাতে পারছেনা আজ।

এই হল বর্তমান দুর্গোৎসবের এক দিক। আর এক দিক হল পূজা সংগঠন সেখানেও মাইক সর্বস্ব কলরোল। প্রত্যক্ষ সংগঠন ছাড়া আর সবাই সর্বজনীন দুর্গোৎসবের বাইরের লোক, পথে পথে ভিড় করে ঠাকুর দেখায় তাদের একমাত্র অধিকার, ফায়ার ব্রিগেড থেকে সন্তোষ মিত্র পার্ক, সেখান থেকে হেইশ পল্লী এই পরিক্রমাতেই আজ বাইরে-না-যেতে-পারা সহরে নিম্নমধ্যবিত্ত ও তন্নিম্ন বিরাট সমাজের দুর্গোৎসব সার্থক, অবশ্য তার সঙ্গে আছে সিনেমা থিয়েটার দেখা।

কেউ কেউ বলেন এত দুর্গাপূজা কেন? আমার তো মনে হয় অধিকসংখ্যক দুর্গাপূজার অর্থনৈতিক সার্থকতা ছাড়াও পাড়ার পূজাগুলি যদি আরও ছোট ছোট ভাগে হয়, তাহলে অনেকের পক্ষে তাতে পুরোপুরি যোগ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। বিরাট জাঁকজমকের দিকে কাঙালিনী মেয়ের মত দূর থেকে তাকিয়ে না থেকে আমরা তাতে নানাভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া পূজামন্ডপে আত্মপ্রকাশ শিল্পের ব্যবস্থা হতে পারে। চিত্রপ্রদর্শনী, গান্ পালা, বক্তৃতা প্রভৃতি যদি দুর্গাপূজার কার্যসূচীর অন্তর্গত হয়, শ্রেণীনির্বিশেষে তবে সে পূজা আমার আপনার সবার হতে পারে।

দেওয়ালীর রোশনাইভরা সন্ধ্যা আমাদের জীবনে কটাই বা আসে, আর মধ্যরাত্রের কালীপূজোর সঙ্গে যদি আগরাত্রি থেকে মুখবন্ধ-অনুষ্ঠান কিছু চলে তবেই উৎসব জমে উঠ্‌তে পারে।

অবশ্য জমবার মনোভাবই কেটে গেছে। আমরা আজ এত আত্মকেন্দ্রিক যে পাঁচজনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলা মেশার গুরুত্বই বোধ করিনা, মিলবার কেন্দ্র কি হবে সে প্রসঙ্গে তাই অবান্তর হয়ে পড়ে।

ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা আমাদের শিখিয়েছে নিমন্ত্রণ খাইয়ে অপচয় করা মূর্খতা। আমাদের আধুনিক বিজ্ঞসমাজ এই উপদেশ খুব মন দিয়ে মেনে চলছেন, কিন্তু নিজেরা নিত্য স্কাইরুম, মোগাম্বো নিদেনপক্ষে কফিহাউসে সময় ও অর্থ অপচয়ের বেলায় অর্থনৈতিক উপদেশের ধার ধারেন না। আনুষ্ঠানিক নিয়ে পৈতে অন্নপ্রাসন শ্রাদ্ধ সামাজিক মিলনের উপলক্ষ্য এবং তাতেই তার উৎসবরূপ। কেও ঘরে খেতে পায়না বলে তাকে দয়া করে একবেলা খেতে ডাকা হয় তা নয়, একসাথে মিলে মিশে খেয়ে দেয়ে আমাদের হৃদ্যতা বাড়ে বলেই এইসব অনুষ্ঠানের সার্থকতা। হোটেলে ডেকে খাইয়ে দেওয়া চলে, বাড়ীতে সবাই এলে আনন্দও মিতালী বাড়ে। তাবলে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে ঐশ্বর্যও পদমর্যাদা প্রদর্শনাতে যাঁরা মশগুল হয়ে পড়েন, তাঁদের কোনমতেই সামাজিক ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি দেওয়া চলেনা।

থিয়েটার সিনেমার জৌলুষ, খেলার মাঠের হুল্লোড় ফুরি বা ক্যাপ্রিতে চাপার্টি কোন কিছুই জাতীয় উৎসবের বিকল্প হতে পারে না অথচ তথাকথিত ভদ্রসমাজ যদি তাদের বৈদগ্ধ্য ও রুচিবিকারের মোহে জাতীয় উৎসবগুলি বর্জন করে চলেন তবে উৎসব বাতিল হয়ে যায়না, কুরুচিতে আচ্ছন্ন হয়ে জীবনে এমন ক্লেদ ছড়িয়ে দেয় যে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কারো থাকেনা।

বর্তমান বিজ্ঞান সভ্যতা মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা করতে করতে মানুষকে এমন আত্ম-আরামপরায়ণ করে তুলেছে যে, আমাদের সমগ্রজীবন সাধনা আজ গুটিয়ে এসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সে-ব্যক্তি যে চন্দ্রলোকে মঙ্গললোকে ছুটছে তাও আত্মকেন্দ্রিকতার বশে। মানুষ আজ সমগ্র বিশ্ব জয় করতে চলছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে নিজের অনুভূতি থেকে, নিকটতম পরিবেশ থেকে ঘনিষ্ঠতম সমাজ থেকে। এর ফলে মানুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি হয়তো বাড়ছে, আনন্দ যাচ্ছে মিলিয়ে, জাতীয় উৎসবগুলির যথার্থ ব্যবহারে সেই আনন্দ সেই ঘনিষ্ঠতা আমরা ফিরে পেতে পারি।

যারা বলেন বর্তমান অবস্থা যান্ত্রিক জীবনের অনিবার্য পরিণতি, আমি তাদের মানতে রাজী নই। ঠিক এমনিই একদিন লোকে ধরে নিয়েছিল যান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতির অনিবার্য আনুষাঙ্গিক কুলিদের শাস্তি, মদের দোকান আর বারবণিতা, শিশুনারী শ্রমিকদের শোষণ। যে বলে মানুষ তার নিজের সৃষ্ট যান্ত্রিকতার কাছে হার মানবে, সে মানুষের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত নয়। সর্বজয়ী মানুষের মহাশক্তির উৎস তার আনন্দময়তা, তার প্রীতিপ্রবণতা। জাতীয় উৎসবের সার্থকরূপায়নই সেই আনন্দময়তা ও প্রীতিপ্রবণতা, তার প্রেমিক সত্তা প্রসারের প্রশস্ততম পথ।

রাখাল ভট্টাচার্য